দেহী বিদেহী

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন প্রকাশন
প্রকাশন বিভাগ

রাম নারায়ণ রাম

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় এবং হেনা মিত্র

সহযোগিতায় ঃ-

নীহার দাস

প্রথম প্রকাশ ঃ-
১লা বৈশাখ, ১৪১৩ (শুভ নববর্ষ)

মুদ্রণে ঃ-
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা (কোলকাতা - ৭০০১১৫)
২) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

মুখবন্ধ

এই মহাসৃষ্টির মাঝে প্রতিনিয়ত এমন অনেক ঘটনা ঘটে চলেছে, সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে যার সঠিক সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আজ আমাদের চারিদিকে শুধুই মৃত্যুর মিছিল। প্রকৃতি কি শুধু জন্ম আর ৬০/৭০/৮০ বছরের পর মৃত্যু — এর জন্যই সৃষ্টি করেছেন? কেন এই জীবজগতের সৃষ্টি? কি উদ্দেশ্যেই বা সৃষ্টি? কে করলো এই সৃষ্টি? কি তাঁর স্বার্থ? জন্মের সাথে সাথে প্রকৃতি মৃত্যুটা কেন দিয়েছেন? আবার মৃত্যুর পর আত্মার কতরকম কতকিছু। মৃত্যুর পর দেহগর্ভ হতে আত্মার সাথে সাথে জ্ঞান, বিচার বুদ্ধি, বিবেক, চৈতন্য যে বেরিয়ে যায়, কি মাত্রায় বেরিয়ে যায়? কোন্ মাত্রায় গেলে জন্মমৃত্যুর চক্র অতিক্রম করে সেই অনন্তসুরে পৌঁছানো সম্ভব, তা আমাদের জানতে হবে।

আমরা পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, জন্ম জন্মান্তরের কথা শুনেছি। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখবার সুযোগ হয়নি। জীবনে চলার পথে অনেক ঘটনা ঘটতে থাকে সঠিকভাবে। কিন্তু কিভাবে ঘটছে, আজও হয়নি তার সমাধান। এই যে জন্মান্তরের ঘটনা বা কারণগুলো আছে, সেইসব কারণের কারণ নিখোঁজের মাঝেই রয়ে গেছে। মৃত্যুর পর কোথায় যাব, আজও তা রহস্যেই রয়ে গেছে। অথচ সৃষ্টির কোন কিছুই ভাব বা কল্পনা নয়। সবকিছুই প্রত্যক্ষের উপর, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সৃষ্টির জলে স্থলে অজস্র কোটি কোটি জীবজন্তু আছে। তাদের প্রত্যেকের কাছে এই পৃথিবীটা একটা পাত্র মাত্র। জন্ম-মৃত্যুর ধারাপাতার ধারায় এমন কিছু আছে যে, অদল বদল হয় এই পাত্রেই। এই পাত্রের মধ্যেই মাত্রাভেদে কেউ মশা, কেউ মাছি, কেউ কাক, কেউ বিড়াল, কেউ কুকুর আবার কেউ বা মানুষ। সুতরাং দেহ নিয়েই এখানে (পৃথিবীতে) মাত্রা বাড়াতে হবে। দেহী ছাড়া বিদেহীর কোন কাজই শুদ্ধ নয়। জপতপ যা কিছু করতে হবে (মাত্রা বাড়ানোর জন্য) দেহ থাকতেই। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই প্রত্যেকের অংশ আছে। মানুষের মধ্যে যা আছে, মশার মধ্যেও তা আছে; শুধু মাত্রাভেদ। তাহলে কতমাত্রায় পৌঁছালে মশা মানুষ হতে পারে বা মানুষের মাত্রা কমে গিয়ে মশা হতে পারে—এই তত্ত্ব আমাদের জানতে হবে। কিন্তু আমরা কি করে জানবো? কে আমাদের জানাবে?

আবহমানকাল ধরে বিচক্ষণেরা প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করে চলেছেন। মৃত্যুর পরে আত্মার কি হয়? আত্মার পুর্নজন্ম হয় কিনা? এ সম্পর্কে আজও তারা কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না। আবার তথাকথিত সংস্কারগত ধর্ম বা শাস্ত্রের মাধ্যমেও এই তত্ত্বের সমাধান সম্ভবপর নয়। তবে কি প্রকৃত ধর্ম প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন? নূতন মত, নূতন দর্শন অর্থাৎ অভিনব দর্শন প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার, যার মাধ্যমে সব পরিবর্তন হবে? এই পথে চলতে গেলে তো বিপ্লব (আমূল পরিবর্তন) আসবে। ঝড়-ঝাপ্‌টা আসবে। ..... আসুক ঝড়, আমরা ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব।

অভিনব দর্শন প্রতিষ্ঠাকল্পে জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত বেদতত্ত্ব কখনো একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে কখনও জন সমুদ্রে বিভিন্ন সময়ে শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেটবন্দী করা হয়েছে। এই বেদতত্ত্ব শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেটবন্দী অবস্থা থেকে মুদ্রণাকারে লিপিবদ্ধ করে (শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমত, যা চলার পথে মানুষের জীবনে জন্ম-মৃত্যু রহস্যের নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দেবে) ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রচারের গুরুদায়িত্ব. তিনি অর্পণ করেছেন। তারই জন্য একটি সংকলন বিভাগ গঠন করে নাম দিয়েছেন **"অভিনব দর্শন"**।

"অভিনব দর্শন" প্রকাশনের সাফল্য কামনা করে আশীর্বাদস্বরূপ তিনি তাঁর বাহনটি আমাদের প্রদান করেছেন। তাঁর দেওয়া বাহন ও তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা মাথায় নিয়ে দশম শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হল **দেহী বিদেহী**।

শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৩

চপল মিত্র
(প্রকাশক)

দেহরূপ গর্ভের অন্তরালে চৈতন্যরূপী আত্মা বিরাজমান

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩
রাজা বসন্ত রায় রোড, কোলকাতা

আমরা একজায়গায় একঘরে ছিলাম। আগে থেকে পড়া (বেরিয়ে যাওয়া) অভ্যাস ছিল বলেই, এই দশমাসের মাথায় মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে এখানে নড়াচড়া করছি। এখানকার বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ? আমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থায় ছিলাম। এখানেও সমস্ত দেহকেই যদি পৃথিবী মায়ের গর্ভরূপে চিন্তা করা যায়, তাহলে দেহরূপ গর্ভের অন্তরালে চৈতন্যরূপী আত্মা বিরাজমান, একথা বললে ভুল হবে কি? তাই এখানকার বর্ত্তমান অবস্থায় ৭/৮/৯/১০ মাসের গর্ভের ন্যায় আমরা আছি; তা যে নয়, তার প্রমাণ কি?

এখানেও সমস্ত দেহকেই যদি পৃথিবী মায়ের গর্ভরূপে চিন্তা করা যায়, তাহলে দেহরূপ গর্ভের অন্তরালে চৈতন্যরূপী আত্মা বিরাজমান, একথা বললে ভুল হবে কি?

কোথা হতে এসেছি, তা জানার ব্যাপারে সমস্যা হতে পারে। কিন্তু এক জায়গায় তো ছিলাম। ৭/৮/৯/১০ মাস বা ৬০/৭০/৮০ বৎসরের এই গর্ভে আছি। কাজেই আমরা মরছি না। এই গর্ভ থেকে বেরিয়ে অন্যত্র যাচ্ছি মাত্র।

মাতৃগর্ভে সন্তান থাকে একটি থলির ভিতরে। সেইসময়ে নাভির

সাহায্যে খাদ্য আহরণ করে। প্রসবের সময় থলে এবং সেইজাতীয় জিনিস ফেলে দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু (মানবের আত্মা) বেরিয়ে আসে। আমাদের এই দেহরূপ আবরণ সেইরূপ (থলে জাতীয়) জিনিস নয়, তা বলিতে পার না। এই নাড়ী, থলে (দেহ) ইত্যাদি জাতীয় জিনিস ফেলে দিয়ে (ত্যাগ করে) যে আর এক জিনিস প্রকাশ হবে না, বলা যায় কি করে? সাপের খোলসের ন্যায় এই খোসারূপ দেহ পড়ে থাকে। তাহলে বেরিয়ে গেল কি? দেখা গেল না তাহা। অর্থাৎ আর একটি রূপের প্রকাশ হচ্ছে।

বস্তুর মাধ্যমেই বস্তুর বস্তুত্ব প্রমানিত হয়।

না দেখা বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আমি যখন আছি, আমার বাবাও আছেন। বাবার বাবা (ঠাকুর্দা) আছেন। ঠাকুর্দার বাবাও ছিলেন। বিদেশ না গেলেও নিজের দেশ দিয়ে বুঝতে পারা যায় যে, বিদেশ আছে। সেইরূপ ভাবে বুঝিতে হইবে যে, মৃত্যুর পর আমরা একেকভাবে প্রকাশিত হচ্ছি।

ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে জলের সৃষ্টি হয়। যেরূপ অদেখার রূপে জল সর্বত্র বিরাজ করে, বাতাসের রূপ না দেখা গেলেও অনুভবে বুঝা যায়, এও (মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থাও) ঠিক তাই। সমস্ত জল যেমন বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, দেখা যায় না। ফটোতে ঔষধের ক্রিয়ায় কিভাবে যে ছাপ পড়ে, বুঝা যায় না। কথা বলার সাথে সাথেই শোনা যায় না। সে কথা শোনা যায়, বলার ১ বা $^{১}/_{২}$ সেকেন্ড পরে। কেউ কিছু বলার সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেলে মৃত্যুর এক সেকেন্ড বা হাফ সেকেন্ড পর তুমি তার কথা শুনতে পারছো। সেইকথা ২ বৎসর, ১০ বৎসর বা ৫০ বৎসর পরেও শোনা যেতে পারে। কারণ মৃত্যুর এক সেকেন্ড পরে তো তুমি তার কথা শুনেছ। শব্দের ভিতর প্রাণ আছে বলে জীবন্তের ভিতর হতে যা কিছু বের হয়, সবই জীবন্ত। যার ভিতর দিয়ে যায়, তাও জীবন্ত।

কথা বলার সাথে সাথেই শোনা যায় না। সে কথা শোনা যায়, বলার ১ বা $^{১}/_{২}$ সেকেন্ড পরে। কেউ কিছু বলার সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেলে মৃত্যুর এক সেকেন্ড বা হাফ সেকেন্ড পর তুমি তার কথা শুনতে পারছো। সেইকথা ২ বৎসর, ১০ বৎসর বা ৫০ বৎসর পরেও শোনা যেতে পারে।

আমরা চির নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে পরলে, ভিতরে যে সাড়া, যে বুঝ, যে চেতন ছিল, দেহযন্ত্র বন্ধ হওয়ার সাথে সব বন্ধ হয়ে গেল। যেসব চেতন, বুদ্ধিবৃত্তি চিন্তা ছিল, তাহা আর একটি অবস্থায় মিশে গেল। আবার আর এক ঘরে গিয়ে কয়েক মাসের জন্য রইলো। সাড়া দিতে পারে না দেহ। পড়ে রয়েছে; শুধু চলে গেল তোমার বুঝ, জ্ঞান, চেতনা, চিন্তা; নিভে গেল। নষ্ট হতে তো পারে না। সূর্যের তাপের ন্যায় একটি জিনিস মৃতদেহের উপরে প্রভাবান্বিত হচ্ছে। সুচিন্তাতে গর্ভের বাচ্চা পর্যন্ত ভাল হয়ে ওঠে। তাই পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। চিন্তার মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য সুবুদ্ধি, সুচিন্তা। চিন্তার মধ্যে এইরূপ যার যত 'সু' আছে, তার বাচ্চা তেমনই রূপ হবে। এখানকার রূপের উপর সেই রূপটি নির্ভর করে। কতগুলি বাচ্চা আছে, জন্মের সাথে সাথেই দৌড়ায়। আমাদেরও সেইভাবে দৌড়াতে হবে।

একটা ডালায় ৫০০ রকম বীজ আছে। ক্ষেত্রে বপন করলে যার যার বিভিন্ন চেহারা দেখাবেই। একস্থানে আছে বলেই সকলে যে একইরূপ হবে, তা কিন্তু নয়। এই যে ৫০০ রকম চেহারার বীজ, দেখলে বুঝা যায় না। এক খোপড়ায় (গর্ভে) থাকলে কি হবে, চিন্তা, বুদ্ধি ইত্যাদি সাধনা অনুযায়ী এক একজন এক এক রূপ নিচ্ছে। ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে দিলে কিরকম একটা গন্ধ রয়ে গেল। ফুঁ দিলে নিভে যায় আবার ঘষা দিলে জ্বলে। কাজেই সব অবস্থাই থাকে। এক এক অবস্থা দেখা দেয় মাত্রা ভেদে। উপর থেকে পড়লে কিছু হয় না। আবার অল্প উঁচু থেকে পড়লে হাত-পা ভেঙে যেতে পারে। হুঁসিয়ার আছে বলেই উঁচু থেকে পড়লেও হাত-পা ভাঙে না। মাত্রা মাফিক যে চলবে, তারই কাজ ভাল হবে।

একস্থানে আছে বলেই সকলে যে একইরূপ হবে, তা কিন্তু নয়। এই যে ৫০০ রকম চেহারার বীজ, দেখলে বুঝা যায় না। এক খোপড়ায় (গর্ভে) থাকলে কি হবে, চিন্তা, বুদ্ধি ইত্যাদি সাধনা অনুযায়ী এক একজন এক এক রূপ নিচ্ছে।

চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলে দেহরূপ গর্ভ থেকে কি বেরিয়ে যায়? জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক চৈতন্য যে বেরিয়ে গেল, কি নিয়ে গেল? যার যার মাত্রা অনুযায়ী মাত্রামাফিক বেরিয়ে গেল। ধরো, তিনমাত্রা হলে কাক হবে (নম্বর

অনুযায়ী হয়)। ডালাতে এক একটি বীজ এক এক নম্বর নিয়ে রয়েছে। মনে কর, পিঁপড়া ৬ নম্বর, বিড়াল ৮ নম্বর। এইভাবে মাত্রা অনুযায়ী, নম্বর অনুযায়ী জীবকুল জন্ম নিয়ে চলেছে। আবার ১ লক্ষ মাত্রায় যিনি থাকবেন, তিনি অবতার হবেন। সবকিছুই থাকবে তাঁর ইচ্ছাধীন। যার যার কাজ অনুযায়ী নম্বর হয়ে গেছে, মাত্রা হয়ে গেছে। যেমন ওজন করালে মানুষ তো থাকে না, ওজনের (মাপ) নিয়ে শুধু একটা কার্ড বেরিয়ে আসে।

ডালাতে এক একটি বীজ এক এক নম্বর নিয়ে রয়েছে। মনে কর, পিঁপড়া ৬ নম্বর, বিড়াল ৮ নম্বর। এইভাবে মাত্রা অনুযায়ী, নম্বর অনুযায়ী জীবকুল জন্ম নিয়ে চলেছে। আবার ১ লক্ষ মাত্রায় যিনি থাকবেন, তিনি অবতার হবেন।

এই নম্বর বা মাত্রাতেই সব দেখতে হবে। কোন্ মাত্রায় গেলে জন্মমৃত্যুর চক্র অতিক্রম করে সেই স্তরে পৌঁছাতে পারা যায়, তার চেষ্টা করতে হবে। যদি সেই স্তরে পৌঁছাতে পারা যায়, তাহলে আর এই খোপরাটিতে (দেহযন্ত্ররূপ গর্ভে) পড়ে হাকি তাকি করতে হবে না। পঞ্চভূতের (ক্ষিতি অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) দ্বারা গঠিত এই দেহ মিশতে পারে তারই সঙ্গে (জল, বাতাস, আগুন) একই সূত্রে বাঁধা আছে বলে। এই দেহে যে গুণ অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা, আত্মা আছে, বাতাস, আগুনেও সেই গুণই আছে। আত্মা আর দেহ একই জায়গায় (পঞ্চভূতে) মিশছে। দেহের মাত্রা তখন সেখানে বিরাজ করে মাত্রানুযায়ী রূপ নিয়ে। এখনকার গড়া (তৈরী হওয়া) অনুযায়ী সেখানে আধিপত্য করে সেই মাত্রা অনুযায়ী। নিজের ইচ্ছাধীন সবকিছু করিতে পারার অবস্থাটি নির্ভর করে, এইখানকার গড়া (তৈরী হওয়া) অনুযায়ী। কোন্ মাত্রায় গড়ে উঠেছে, তাঁর উপর নির্ভর করে সবকিছু। এখন গড়াটাই (নিজেকে তৈরী করাটাই) হচ্ছে প্রধান কাজ। প্রকৃতির সেই ধারা হতে বিচ্যুত হয়ে গেলে কিছুই হবে না।

নিজের ইচ্ছাধীন সবকিছু করিতে পারার অবস্থাটি নির্ভর করে, এইখানকার গড়া (তৈরী হওয়া) অনুযায়ী। কোন্ মাত্রায় গড়ে উঠেছে, তাঁর উপর নির্ভর করে সবকিছু।

এখানকার সাধু মহানরা বেশীরভাগই বলে থাকেন, কাম ত্যাগ না করলে ধর্ম হয় না। কাম কি কেহ ছাড়তে পারে? ১৩ বৎসর বয়সে আমি লং পাহাড়ে গিয়েছিলাম। সেখানে একেকজন সাধু আছেন, তাঁদের কারও

বয়স ২৫০ বৎসর, কারও বা ৩০০ বৎসর। তাঁদেরও অনেকের ধারণা তাঁরা কামবর্জন করেছেন। আমি তাঁদের বলেছি, কাম কখনও বর্জন হয় না। চোখে দেখা, কানে শোনা, সবই কাম। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবই কাম। কাম ত্যাগ করে ভগবান পেতে হলে সে কখনও ভগবান পাবে না। জগতের যেকোন বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যোগাযোগ হওয়াই কাম। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি (Satisfaction-ই) হলো কাম। ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হওয়াই কাম। জিহ্বায় (রসনায়) স্বাদ নেওয়া, রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি—কাম। চোখে কোন সুন্দর দৃশ্য দেখা—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি—কাম। রক্ত-মাংসে গঠিত দেহের সংস্পর্শে কোন ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হওয়াই কাম। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক — সমস্তই লিঙ্গ। যে কোন লিঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই কাম। প্রতিটি লিঙ্গের মাত্রা একই। প্রত্যেক লিঙ্গের সাহায্যে তৃপ্তিলাভ করাই কাম। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ - পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকের নিজস্ব সত্তা আছে। কর্ণ, চক্ষু ইত্যাদি প্রতিটি লিঙ্গই তৃপ্তি লাভ করছে। কাজেই কোন একটি ইন্দ্রিয়কে গুরুত্ব দিয়ে তোমরা একটা বড় ভুল করছো। রক্ত মাংসে গঠিত সমস্ত দেহ। কাজেই প্রতিটি লিঙ্গের গুরুত্বই সমান।

রক্ত-মাংসে গঠিত দেহের সংস্পর্শে কোন ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হওয়াই কাম। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক — সমস্তই লিঙ্গ। যে কোন লিঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই কাম। প্রতিটি লিঙ্গের মাত্রা একই। প্রত্যেক লিঙ্গের সাহায্যে তৃপ্তিলাভ করাই কাম।

নিদাঘের রাগে জল বাষ্প হয়ে মহাশূন্যে জমা হয়। আবার জল যখন বৃষ্টি হয়ে পড়ে, তখন দেখতে পাও। জলের বাষ্প হয়ে চলে যাওয়া তুমি দেখনি বলে কি জল যায়নি? বাষ্পাকারে গেছে। এখন বাষ্পাকারে যাক, আর নল দিয়ে যাক্, টানা (টেনে নেওয়া) শক্তির শক্তিতে যাচ্ছে, এটা তো মানতে হবে। কাজেই তৃপ্তিই (Satisfaction-ই) হচ্ছে কাম। এই কাম সমভাবে থেকে যাচ্ছে দেহের সর্বত্র। এই কাম বর্জন হয় না। বিরাটের চিন্তাধারার সাহচর্যকারী এই কাম। আবার চোখে দেখতে পার বলে কি, সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাক? কাজেই সমতার সুর Maintain করার কথাই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য। যারা বলেছেন, কাম ত্যাগ করেছেন, সে কথা ঠিক হয় নাই। রাস্তা দিয়ে

বিরাটের চিন্তাধারার সাহচর্যকারী এই কাম। আবার চোখে দেখতে পার বলে কি, সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাক? কাজেই সমতার সুর Maintain করার কথাই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য।

গেলে সুন্দর জিনিস দেখলে কি ভাল লাগে না? কি ছাড়বে তুমি? ক্ষুধা, তৃষ্ণার মত কিছুই ছাড়া যায় না। প্রকৃত মহানরা এভাবে বলতে পারেন না। তাদের পথ অনুযায়ী, তারা সেভাবেই সমতার সুর Maintain করেছেন।

এখানে ধর্মের নামে বেশীর ভাগই বিকৃত করে দিয়েছে। তারা (এখানকার বেশীর ভাগ সাধু, মহানরা) বেদকে তো জানবে। বেদকেও তো জানতে পারছে না। কাজেই সংস্কারের যে ফোঁড়া হয়ে গেছে, সেই অবস্থার জন্য দেশকে দুর্দিন Face করতে হচ্ছে। নিজেদের মধ্যেই চিন্তা করে দেখ না, ছাড়তে পারা যায় কি? তাদের (তথাগত সংস্কারগত ধার্মিকদের) কথামত যদি চল, তাহলে তো জীবনভর আফশোস করতে হবে। মৃত্যু পর্যন্ত কেবল ভাবতে হবে, হায় হুতাশ করতে হবে। এত বিরাট প্রকৃতির সৃষ্টি কি হায় হুতাশ করার জন্য? দেহের মধ্যে যেখানে একটি লোমকূপ পর্যন্ত কি সুন্দরভাবে সাজানো, সেখানে আমরা হায় হুতাশে শেষ হয়ে যাব? কেন, ভগবত প্রেমে আপনি উন্মাদ হয়ে যায় না? তোমাদের ভিতরে সুন্দর জিনিসটা ফুটতে পারছে না। ''আছে'' জিনিসটাই এখানে জাপ্য হয়ে গেছে। একটা চিঠি এসেছে, 'তোমার শ্বশুর Promotion পেয়ে কাল আরা গেছেন।' হয়ে গেছে 'কাল মারা গেছেন।' একটা Wording এর change - এ কত ব্যাতিক্রম হয়ে গেছে। শব্দের মারপ্যাঁচে আমরা মারা যাচ্ছি।

কেন, ভগবত প্রেমে আপনি উন্মাদ হয়ে যায় না? তোমাদের ভিতরে সুন্দর জিনিসটা ফুটতে পারছে না। ''আছে'' জিনিসটাই এখানে জাপ্য হয়ে গেছে।

সূর্যোদয়ের আগে আকাশে লালের আভাষে (সূর্যকে দেখা না গেলেও) যেমন বুঝিতে পারা যায়, সূর্যের কি অপরূপ রূপ, আমার একথাগুলো সেরূপ বলা হলো জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে একটা আভাষ দেওয়ার জন্য শুধু। Confution এর কথা কতকটা অস্ত্রবিশেষ। সন্দেহ ঘুচে গেলে কাজ এগুতে পারে না। জানবার আগ্রহটাও কমে

সূর্যোদয়ের আগে আকাশে লালের আভাষে (সূর্যকে দেখা না গেলেও) যেমন বুঝিতে পারা যায়, সূর্যের কি অপরূপ রূপ, আমার একথাগুলো সেরূপ বলা হলো জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে একটা আভাষ দেওয়ার জন্য শুধু।

যায়। সিদ্ধি দেখিলেই সিদ্ধিতে নিতে হবে। দ্বন্দ্ব, সন্দিগ্ধতা রাখিতেই হবে। আগে সন্ধিপূজা করতে হবে। সেইরূপ সন্ধিক্ষণে রাখতে হবে। পশুরাজ তার শাবককে শিকার শেখানোর পর জঙ্গলে পাঠিয়ে দেয় শিকারের জন্য। ইচ্ছামত সন্দেহ করতে থাকলেই যে ওস্তাদ হয়ে গেলাম, তা কিন্তু নয়। একটা নৌকা জলে ডুবে থাকলে কোন একটা সূত্র ধরে খুঁজে পেয়ে পারে আনা যায়। একটা কলার চোকলা (খোসা) টেনে নেয় বহুদূর। দিশেহারা নাবিক একটা পাখীর বাসা দেখে বহুদূরে গিয়ে পারের সন্ধান পেয়েছিল। ঐ জায়গাটায় চোকলার দরকার। চোকলা দেখার দরকার নাই। সাগরে পৌঁছালেই হল। পথের বর্ণনায় নানা বাধা বিপত্তি, জলতৃষ্ণা, ক্ষুধা ইত্যাদি বহুরকমের কথাবার্ত্তা দিয়ে কি হবে?

মহাসাগরের বর্ণনা করা যায় না। সন্দিগ্ধতা বা সন্দেহের ভিতর দিয়েই যদি মহাসাগরে পৌঁছানো যায়, তাহাই করতে হবে। পাহাড়িয়া রাস্তায় ট্রেন চালাইতে বালুর প্রয়োজন হয়।' মাঝপথে ধুলারূপ সন্দেহ এলেও ক্ষতির কিছু নেই। ঘাস নিংড়ালে দুধ বের হয় না। কিন্তু দুধ দেখলে ঘাস আসে চিন্তাতে। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, যার যার নিজের চিন্তা ও বৃত্তি অনুযায়ী তোমরা সবসময় Food নিচ্ছ প্রকৃতি হতে। চিন্তার সাহায্যে অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস নিয়ে এক বিরাট খোরাকের বস্তু আহরণ করে চলেছ প্রতিদিন। এইভাবে ৬০ বৎসরের কাজ খুঁজে দেখলে পুরো ১০ দিনের ভাল কাজ পাওয়া যায় না। মনের আহরণে মধু না থাকলে এগিয়ে যাওয়া যাবে কি করে? বন্ধ ঘরে (কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে) বিষ; সেদিকে খেয়াল রেখে চলতে হবে।

ঘাস নিংড়ালে দুধ বের হয় না। কিন্তু দুধ দেখলে ঘাস আসে চিন্তাতে। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, যার যার নিজের চিন্তা ও বৃত্তি অনুযায়ী তোমরা সবসময় Food নিচ্ছ প্রকৃতি হতে।

মধুকরের মত সবসময় সুচিন্তা, সুন্দর জিনিস গ্রহণের ভাব রাখতে হবে। সকলের প্রতি সাম্যভাব বজায় রাখতে হবে। একটা হাতী বন্যায় ভেসে এসেছে। সেই দেশে আগে কেউ হাতী দেখে নি। সুতরাং কেউই বুঝতে পারছে না, বস্তুটা কি? সেই

এখানে বেশীরভাগেরই জীবনভর পাপ মন। শুধু হায়-হুতাশ আর 'হচ্ছে না', 'হবে না' জাতীয় কথা।

দেশে এক 'বিদ্যাভূষণ' আছে। তিনি বুঝতে পারেননি, তাতো হতে পারে না। কাজেই দশ মাইল দূর হতে তাকে পাল্‌কি করে নিয়ে আসা হোল। তিনি এসে বললেন, ''গতকালের অন্ধকারটা জমে গেছে''। সবাই খুশীতে হাততালি দিয়ে উঠল। হাত তো উঠলো, হাত তালির ঠেলাতে। তখন তিনি বললেন, ''এখন অন্ধকার সরতে আরম্ভ করেছে।'' এখানে বেশীরভাগেরই জীবনভর পাপ মন। শুধু হায়-হুতাশ আর 'হচ্ছে না', 'হবে না' জাতীয় কথা। পাহাড়ে যাই। সেখানে এসব কথা তো হয় না। এখানের এইসব কথা হচ্ছে মরাজাতীয় কথা। একজন পঁচিশ বছর জপধ্যান করছে, তবু বলছে, 'মন তো ঠিক হচ্ছে না।' ত্রিশ বছরে আরম্ভ করেছ। তারপর পঁচিশ বছর আরাধনা করছো। ৫০০ বছর পরেও এইরূপ করবে, 'কিছু হচ্ছে না। কিছু হলো না।' ছোট বয়সে দোকানে গিয়েছিলাম বাকীতে সাবু কিনতে। গিয়ে দেখি, লেখা রয়েছে, 'আজ নগদ, কাল বাকী।' পরদিন বাকীতে আনতে গিয়ে দেখি, একই কথা লেখা। বুঝলাম, কোনদিনই বাকীতে আনা যাবে না। আমার ঠাকুমার ৯৫ বৎসর বয়স যখন, তখন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। এত কাজ, জপতপ করার পরও তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মিলবে না?'

— আমি বলি, 'না এভাবে মিলবে না। এর সহজ পথ পদ্ধতি আছে।' শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ জানিয়ে দিতে হবে। মূর্ত্তিপূজা, যাগযজ্ঞ - তখনকার দিনে এসবের প্রয়োজন ছিল। সেই সময় গাছের ফল কেহ খায় না। মনে করে বিষ। একজনের ঠাকুরদা খেয়েছিল। তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে গাছের ফল খাওয়ানো শেখানো হল। সমস্ত সমাজে শৃঙ্খলা আনার জন্য, দেশবাসীকে শেখাবার জন্য বিচক্ষনেরা মূর্ত্তির ভিতর দিয়ে গুছাতে আরম্ভ করলো। মূর্ত্তিপূজা, একটা বিরাট Art. এই মূর্ত্তির পূজা আছে বলেই ঢাকিওয়ালা, বাজনাওয়ালা, অর্থ উপার্জন করার সুযোগ পেল। হাজার হাজার মূর্ত্তি তৈরী হচ্ছে, হাজার হাজার জায়গায় পূজা হচ্ছে। এমনি আর পুতুল কয়জনা কেনে? একটা নির্দিষ্ট পূজা আছে বলেই শিল্পীরা সুন্দরভাবে শিখে নিচ্ছে।

একটা নির্দিষ্ট পূজা আছে বলেই শিল্পীরা সুন্দরভাবে শিখে নিচ্ছে। অনির্দিষ্টের উপরে কেহ শেখে না, শিখতে পারে না। এই যে শিখিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি, নিয়ম কানুন সব সুন্দরভাবে সাজানো আছে।

অনির্দিষ্টের উপরে কেহ শেখে না, শিখতে পারে না। এই যে শিখিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি, নিয়ম কানুন সব সুন্দরভাবে সাজানো আছে। বাচ্চা শিশুদের যেমন ভূতের ভয় দেখানোর পরে ভূত আছে কি না নিজেরাই দেখে, তেমনিভাবে এই পূজাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কাজের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। বাড়ীঘর, পথঘাট পরিষ্কার করা, যে যে মূর্ত্তি যা যা ভালবাসে, সেইসব ফলমুল আহারের ব্যবস্থা করা, আরও যাতে সুন্দরভাবে করতে পারে, আরও যাতে ভাল করতে পারে, তারজন্য প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে। আজকে সবকিছুই অন্যরূপ হয়ে গেছে। কথায় বলে, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর', এর কোন স্থায়িত্ব নেই।

বিশ্বের রহস্য বুঝতে হলে Tune টা Maintain করতে হবে। সা রে গা মা র ভিতরে যে সব সুর আছে, প্রথমে বুঝা যায় না। ছাব্বিশটা অক্ষরের মধ্যেই বিশ্বের সব D. Litt, Ph. D. পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত লোকেরা যাবতীয় গ্রন্থ, গবেষণার বিষয়বস্তু রচনা করেছেন। এই মন্ত্রের মধ্যেই মূলাধার হতে সহস্রার পর্যন্ত সব সুর গাঁথা। এই মন্ত্রের সুরই ত্যানা ত্যানা ধিন ত্যানা - এই শব্দ নিয়ে তুমি বসে পড়লে। এমন একটা সুরকে জাগিয়ে দিতে হবে, যার মাধ্যমে সব সুর ধরা পড়বে। এই পূর্ণতার সুরই হচ্ছে মন্ত্রের সুর। এই সুরটাই তোমার Maintain করতে হবে। তাতে তোমার দুঃখের মধ্যে ছেলে মরার খবর আসলেও ক্ষতি নাই, তাতে আরও বিস্তার হবে। তোমাদের আছে আশার বাণী, নৈরাশ্যের নয়। নিরাশ হওয়ার কোন কথা নেই।

ছাব্বিশটা অক্ষরের মধ্যেই বিশ্বের সব D. Litt, Ph. D. পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত লোকেরা যাবতীয় গ্রন্থ, গবেষণার বিষয়বস্তু রচনা করেছেন।

প্রশ্ন ঃ- মূর্ত্তিপূজা করতে হবে এখন?

উত্তর ঃ- হ্যাঁ করবে, অর্থবোধে তুমি বেদের পূজা করবে। এখানকার কি আছে না আছে, তা দেখার প্রয়োজনীয়তা নেই। পদ্মা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বহুদূর চলে গেছে।

আদি পালিতে প্রথমে যে বেদের কথাই ছিল, সে কথা তোমরা জান। তোমরা মসজিদে যাও, তাদের সহযোগিতা কর, ক্ষতি নেই। একটা লোক যখন কাঁদে, তাতে সুর থাকে না? দেখতে হবে, তোমার জীবনযাত্রার চলার

পথে কোন সুরকে আশ্রয় করে তুমি চলছো? মন্ত্র হচ্ছে সেই সুর। সব কথাই মন্ত্র। তবে সেই মন্ত্র হতে তুমি এমন একটা সুর নিয়ে এসেছ, সব কিছু জানার পক্ষে সেই সুরই যথেষ্ট।

একটা ধান, একটা বীজই যথেষ্ট। সেইরূপ একটা বীজ এই দেহক্ষেত্রে, এই নাদবীজ সুন্দর ভাবে জপ করতে করতে যাচ্ছ যাবে, কোন চিন্তা করবে না। তোমরা ডাল ভাত যখন খাও, বুঝতে পার কি, এ হতে রক্ত মাংস হবে? একটা মাকড়সার সুতো পৃথিবীকে ঘিরতে পারে। তোমার সেই সুরের যে সূত্র যত তুমি টানবে, তত ছড়িয়ে যাবে। অণিমা, লঘিমা, অষ্ট শক্তির ক্ষমতা আপনি ফুটে উঠবে। জন্মগত না হলে, সেই অধিকার নিয়ে না আসলে হয় না। গুরুর পরিচয় নিতে হবে, ছেলেমেয়ে বিবাহেতে যেমন নিতে হয়। উড়ে আসলেই গুরু হয় না। বংশ পরিচয়, পরিবেশ সব নিয়েই যোগাযোগ করতে হয়। চাকুরীর জন্য গেলে যেমন experience, qualification সবকিছু জানাতে হয়। গুরুর সম্বন্ধে পরিচয় নিতে হলেও সব জানতে হয়। আমাদের দেশের গুরুরা সাধারণতঃ পরিচয় দেয় না। পরিচয় না জেনে এমনি তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন, তা শুনলেই হবে না। এমনি মুখের কথায় হয় না। তার ইতিহাস নেবে। ৩০/৪০ বছরে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। কাজেই ৪০ বৎসরের আগের ঘটনাগুলো, সংস্কারগুলো তাকে আক্রমণ করবেই।

আমাদের দেশের গুরুরা সাধারণতঃ পরিচয় দেয় না। পরিচয় না জেনে এমনি তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন, তা শুনলেই হবে না। এমনি মুখের কথায় হয় না। তার ইতিহাস নেবে। ৩০/৪০ বছরে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। কাজেই ৪০ বৎসরের আগের ঘটনাগুলো, সংস্কারগুলো তাকে আক্রমণ করবেই।

গুরুর সম্বন্ধে প্রথমে বাহ্যিক সম্বন্ধ করবে। তারপর ক্রমশঃ ক্রমশঃ জেনে নাও তার সমস্ত কার্যকলাপ, পরিস্থিতি, কোন্ বংশে জন্ম, কখন কিভাবে আরম্ভ করেছেন, সব জানবে। দেখবে বাহ্যিক পরিচয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে কি না। তারপর নিও অন্তরের পরিচয়।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

ঘুমটা যদি মৃত্যু না হয় তবে মৃত্যুটাও মৃত্যু নয়

পাম এ্যাভিনিউ, কোলকাতা
২০ শে জুন, ১৯৬৪

সাধারণতঃ এই পৃথিবীতে যারা জন্মগ্রহণ করেন, এই যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়, কিভাবে হয়? এই পরিদৃশ্যমান জগতে চারিদিকে তাকালেই দেখা যায় নানা রকম রূপ, এসব কোত্থেকে হচ্ছে? সবকিছুই যে Setting (সাজানো) হয়ে আসছে। একখানি ঘর কেউ না সাজালে সাজানো যে যায় না। এই জগৎকে, বিশ্বব্রহ্মান্ডকে কে সাজালো? সে যে কতবড় Artist, চিন্তা করা যায় না। কারোরই একরকম চেহারা নয়, একরকম রূপ নয়। শুধু মানুষ নয়, যত জীব আছে, যত অগণিত বিভিন্ন রকম জীব আছে, গুণে শেষ করা যায় না। এরা সব কোত্থেকে এল? কে করলো? কেন করলো? কোন্ প্রয়োজনে? শুধু জীব নয়, এত বিভিন্ন গাছ, এত যে রকমারি বস্তু গুণতে গুণতে লক্ষ লক্ষ বছর চলে যাবে। আজও সৃষ্টি হয়ে আসছে। এই যে অপরূপ সৃষ্টি, কেন? এতবড় বিরাট সৃষ্টি তো কারণ ছাড়া হতে পারে না। এই সৃষ্টিরহস্যে এতটুকু বস্তুও কারণ ছাড়া নয়। এই রকমারি সৃষ্টির কি প্রয়োজন?

তোমরা পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, জন্ম-জন্মান্তরের কথা শুনেছ। প্রত্যক্ষ দেখবার সুযোগ হয় নাই। জীবনের চলার পথে কতগুলো ঘটনা ঘটতে থাকে সঠিকভাবে; কিন্তু কিভাবে ঘটছে, আজও হয়নি তার সমাধান। এই যে জন্মান্তরের ঘটনা বা কারণগুলো আছে, সেগুলো তোমাদের জানা উচিত। মৃত্যুর পরে কোথায় যায়, আজও তা রহস্যেই রয়ে গেল। আজও তা অজানাই রয়ে গেছে। আমরা কি করে জানতে পারি স্বাভাবিকভাবে, মৃত্যুর পর

তোমরা পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, জন্ম-জন্মান্তরের কথা শুনেছ। প্রত্যক্ষ দেখবার সুযোগ হয় নাই। জীবনের চলার পথে কতগুলো ঘটনা ঘটতে থাকে সঠিকভাবে; কিন্তু কিভাবে ঘটছে, আজও হয়নি তার সমাধান। এই যে জন্মান্তরের ঘটনা বা কারণগুলো আছে, সেগুলো তোমাদের জানা উচিত।

আমাদের কি হতে পারে। সৃষ্টিতে কোন জিনিস ভগবান বল, আধ্যাত্মিকতা বল, যাই বল কোনটাই কল্পনায় রাখে নাই। প্রত্যক্ষের উপর সব আছে। কাজেই বাস্তবে যা রয়েছে, তা দিয়েই আমরা দেখতে পারবো, মৃত্যুর পর কি হয়। শুধু ভূতপ্রেতের কথা নয়, আমাদের চোখের সামনে যা আছে, তা দিয়েই আগে দেখা যাক, তারপর না হয় পরবর্ত্তী কি আছে, তা দেখা যাবে। লটারী যে করে, লটারী যে হয়, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা টিকিট কেনে, তাদের মধ্যে থেকেই তো পায়। যেসব টিকিট বিক্রী হয়েছে, তাদের কাউন্টার পার্টগুলি (টিকিটের অপর একটি কপি) জমা দিতে হয়। তারপর সেই বিক্রী করা টিকিটগুলি একজায়গায় (একটি পাত্রে) একইরকমভাবে ভাঁজ করে রাখা হয়। সেই ভাঁজ করা কাগজগুলি থেকে একটি কাগজ তুলে নেওয়া হল। এইবার এই তুলে নেওয়া কাগজটির (টিকিটের) নম্বর, যারা টিকিট কিনেছেন, তাদের মধ্যে যার নম্বরের সাথে ঐ নম্বর মিলে যাবে, তিনিই লটারী পেলেন।

পৃথিবীতে এই যে সৃষ্টি, জলে স্থলে অজস্র কোটি কোটি জন্তু, জীব আছে, তা আমাদের প্রত্যেকের কাছে একটা পাত্র। এই যে পিপীলিকা বা মশা বলতে পারে, 'আমি মানুষ হতে পারি।' আবার মানুষ মশা হতে পারে। কারণ পৃথিবীর বুকে যা যা হয় প্রত্যেকে যার যার প্রয়োজনে খাচ্ছে, পাচ্ছে, টানছে, নিচ্ছে। আবার পৃথিবী হতে যা হচ্ছে, এই হওয়াটাই আমাদের হওয়া। এমন কিছু আছে যে, অদলবদল এই পাত্রেই। এই ছকের মধ্যেই থাকতে হবে। হয় মশা হয়ে, নয় মাছি, নয় মানুষ হয়ে। প্রত্যেক জীবের প্রত্যেকের মধ্যে প্রত্যেকটি অংশ আছে। যতগুলো অগণিত কোটি কোটি জীব আছে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের মধ্যে পূর্ণভাবে আছে। মানুষের মধ্যে যা আছে, মশার মধ্যে তা আছে। আমাদের মধ্যে মনে কর, ২০০ Gland থেকে ৩২,২০০ Gland আছে। মশার মনে কর, ৬টা ফুটেছে। সহজ করে বলছি, প্রত্যেকে প্রত্যেকের অংশ নিয়ে তৈরী হচ্ছে। মনে কর, সমস্ত মিলে ১০,০০০ gland বা অংশ আছে। এই ১০,০০০ গ্ল্যান্ডের মধ্যে কারও ৫টা,

পৃথিবীতে এই যে সৃষ্টি, জলে স্থলে অজস্র কোটি কোটি জন্তু, জীব আছে, তা আমাদের প্রত্যেকের কাছে একটা পাত্র। এই যে পিপীলিকা বা মশা বলতে পারে, 'আমি মানুষ হতে পারি।' আবার মানুষ মশা হতে পারে।

কারও ১০টা, কারও ৩০টা, কারও ১০০টা, আবার কারও বা ৫০০টা গ্ল্যান্ড ফুটেছে। কিন্তু সমস্ত জীবের মধ্যে ১০ হাজার করে গ্ল্যান্ড আছে। ধরে নাও মানুষের মধ্যে ১৫০, অমুকের মধ্যে ১২, এইভাবে ফুটে ফুটে অগণিত জীব হয়েছে। একরকমভাবে কারো ফোটে না। ১০,০০০ গ্ল্যান্ড কারোর একরকমভাবে ফোটে না। গ্ল্যান্ডের এই ফোটাটা কারোর ইচ্ছামাত্রে হয় না। ধর ১১টা গ্ল্যান্ড ফুটলে মশা হবে, মশা হয়ে আছে। এই মানুষটাই মশা হবে, যদি সে ১১ মাত্রায় নেমে আসে। ধর, মানুষের ১৫০ টা গ্ল্যান্ড ফুটে আছে, কিন্তু ১১তে নামলে সে মশা হয়ে যাবে। আমাদের যদি সব বন্ধ হয়ে সুধু ১১টা গ্ল্যান্ড ফোটে, তবে আমরা মশা হয়ে যাবো। ঐ জ্ঞানের মাত্রা অনুযায়ী সমস্ত রকম জীবজন্তুগুলোর গ্ল্যান্ড ফুটে আছে। সবার মধ্যে ১০,০০০ পর্যন্ত গ্ল্যান্ড আছে কিন্তু। তাতেই সমস্ত জীব জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়ে চলেছে। ১০,০০০ মাত্রা ছেড়ে ১০,০০১ মাত্রায় পৌঁছালে আর ঐ ছকের (জন্মমৃত্যুর চক্রের) মধ্যে পড়তে হবে না।

সবার মধ্যে ১০,০০০ পর্যন্ত গ্ল্যান্ড আছে কিন্তু। তাতেই সমস্ত জীব জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়ে চলেছে। ১০,০০০ মাত্রা ছেড়ে ১০,০০১ মাত্রায় পৌঁছালে আর ঐ ছকের (জন্মমৃত্যুর চক্রের) মধ্যে পড়তে হবে না।

পিঁপড়া বড়ো (শ্রেষ্ঠ), না মানুষ বড়ো, সে কথা আলাদা। ধর, মানুষের ১৫০ মাত্রা আছে আর পিঁপড়ার আছে ১৮ মাত্রা। মরার সময় তুমি ১৮ মাত্রা নিয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে পিঁপড়া হয়ে যাবে। ১৮/১৯/২০/২১, যা বল (যে মাত্রাই বল)। তুমি ১৫০ মাত্রায় ছিলে বলে ১৫০ মাত্রাই নিয়ে যাবে, তা হয় না। এই যে মনের (Mind) অবস্থা চলছে তোমাদের, মাত্রা যে কোথায় আছে, সেটাই হল কথা। কারও ৩০০/৪৫০ মাত্রা হতে পারে। আমাদের কার যে কোন্ মাত্রা, বলা যায় না। সবচেয়ে বড়-কথা হল ১০,০০১ মাত্রায় পৌঁছালে আর এই রকমারি ছকে থাকতে হবে না। Death-টা (মৃত্যুটা) যখন আছে, ঐ Finishing অবস্থাটা রয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর পর দেহ তার চৈতন্য, তার Parts, তার অংশ মিশে যাওয়ার অবস্থায় মাত্রা থেকে

মানুষ তীর্থে যায় কেন? দান করতে। ধর্ম আচরণ করে পুণ্য অর্জন করতে, যাতে তার মাত্রাটা উঁচুতে থাকে। তারজন্য এত সাধনা, এত ধ্যান ধারণা। কিন্তু সহজপথে আমাদের সংস্কারে এসবের ওঠানামা আছে।

যাচ্ছে। মানুষ তীর্থে যায় কেন? দান করতে। ধর্ম আচরণ করে পুণ্য অর্জন করতে, যাতে তার মাত্রাটা উঁচুতে থাকে। তারজন্য এত সাধনা, এত ধ্যান ধারণা। কিন্তু সহজপথে আমাদের সংস্কারে এসবের ওঠানামা আছে। প্রত্যেকটি মাত্রার ওঠানামা আছে। একটা জীব মারলে পাপ হয়; ঝপ করে নেমে গেল। সিংহ সবসময় তাজা জিনিস খায়। সে প্রাণী মেরে মেরে খাচ্ছে। জীবকুল (সমস্ত জীব) সবসময় একে অন্যকে মারছে, কাটছে। তবে তো কারোর ভগবান দর্শন হবে না। শাস্ত্রগত বিচারে গেলে কারো ভগবদ্ দর্শন নেই। কোন্ মহাপুরুষ কে না মশা মেরেছে, বাংলাদেশের কোন্ মহাপুরুষ পাঁঠা খেয়েছে। কেহ তাহলে ভগবান পাবে না, উদ্ধার হবে না। আমরা মাছ, মাংস খেলে হবে কি, হবে না সেটা বলছি না, পাপ পাপই। বাচ্চা শিশু আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই। অনেকে পিঁপড়া মারছে, মারছেই; আমি সেটায় আসছিনা। কই, মাগুর, মুরগী, কে কোন্টা না মারছে। তাহলে তো কেহ স্বর্গদ্বারে কেন কোন দ্বারেই পৌঁছাতে পারছে না। আমি তোমাদের কোন কিছুই বন্ধ করে দিচ্ছি না। আমার আপত্তিজনক কিছু না থাকলেও ছোট বয়স হতে আমি ইচ্ছা করে একটা পিঁপড়াও মারি নাই, গাছের একটা পাতাও ছিঁড়ি নাই। পাখী, কচ্ছপ কিনে ছেড়ে দিয়েছি। তবে মেরেও আমার পাপ নেই, না মেরেও আমার পুণ্য নেই, কথার কথা বলছি। মা কালীর কাছেই মারুক, আর দোকান ঘরেই মারুক, মারা মারাই। শাস্ত্রের দিক দিয়ে বিচার কর, মরেছে মরেছেই। একদিক দিয়ে দেখলে কারও উদ্ধার হবে না। এই ছকেই (জন্ম মৃত্যুর) ঘুরতে হবে। তবে বিরাট মহাপুরুষরা এলেন কিভাবে? এই ছক থেকে কিভাবে উদ্ধার হওয়া যায়?

ছোট বেলাকার কথা বলছি। একটা গাভী কার বাড়ীর গাছ খেয়ে ফেলেছে। যার গাছ খেয়েছে অমনি কয়েক ঘা বারি দিয়েছে। গাভী চিৎ হয়ে সটান পড়ে গেছে। গাভী শেষ। যে মেরেছে গাভীকে, তার তো সাংঘাতিক অবস্থা। ছুটছে পন্ডিতের বাড়ী। পন্ডিতও বুঝেছে, 'এবার পেয়েছি'। কি করতে হবে? না প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এতবড় এক ফর্দ দিয়েছে। কমিয়ে, সংক্ষেপ করে হল তিনমণ চাউল; এক একদিনে হাজার/বারশো টাকা লেগেছে। আগের দিন থেকে সংযম। পরেরদিন যজ্ঞ, ঘৃত সহযোগে। অগ্নির কাছে, বরুণের

অগ্নির কাছে, বরুণের কাছে, শিবের কাছে, সবদেবতাদের কাছে চিৎকার করে জানাচ্ছে, মন্ত্র পড়ছে, ফাঁকে বৃষ্টি হয়েছে। বলে, 'যাও, শান্তি হলো'। এতে যে শান্তি পেল, তাতে তার মনে আর কিছু রইলো না।

কাছে, শিবের কাছে, সব দেবতাদের কাছে চিৎকার করে জানাচ্ছে, মন্ত্র পড়ছে, ফাঁকে বৃষ্টি হয়েছে। বলে, 'যাও, শান্তি হলো'। এতে যে শান্তি পেল, তাতে তার মনে আর কিছু রইলো না। গাভী হত্যার জন্য, এই মনের শান্তি যজ্ঞ টজ্ঞ করে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করলো, তাতে কিছুটা হলো। আমার সমস্ত তোমাকে সাক্ষ্য করে নিবেদন করলাম, হে বরুণ আপ ধন্ব ইত্যাদি করতে করতে ং ঃ ঁ দিয়ে ঠং ঠং করলো। সেই ব্যক্তি মনে করলো, হ্যাঁ ঠিক।' তারপর হাতজোড় করে প্রত্যেককে তৃপ্তি করে খাওয়ালো, প্রত্যেকের পাতা নিয়ে পরিষ্কার টরিষ্কার করে দক্ষিণা দিয়ে বিদায়। শান্তি মন্ত্রটা আর কিছু না। হে অগ্নিদেব, হে শিব, হে বরুণ, আমি ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক যা কিছু করেছি, তোমাকে দিলাম। আমি আর কিছু অন্যায় করিব না। আমি জল সেচনের দ্বারা সব ধুয়ে মুছে ফেললাম। চন্দনে, পুষ্পে, দানে ইত্যাদি করে শেষ হয়ে গেল। আর আমি যদি এটা বসে বসে করি, তার Result একই হবে। বাচ্চারা এমনি শিখবে। নানারকম আজকাল বেরিয়ে গেছে, 'ক'-এ কলম, 'খ'-এ খড়ম ইত্যাদি। এতে অল্পতে তাড়াতাড়ি ভালভাবে শিখে নিতে পারে। এটা সহজ পথ। সকলের পক্ষে হাজার বারশো টাকা খরচ করাতো সম্ভব নয়। প্রত্যেকের পাপের জন্য পাতি (ফর্দ) লিখতে হলে তবে আর উদ্ধার হবে না। মনের যে দ্বন্দ্ব তাতো ঘোচে না। পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তি সমস্ত ক্ষমতার মালিক হতে পারে যদি মনের আর মুখের কথা এক হয়ে যায়। স্বপ্নে মনের আর মুখের কথা এক হয় বলে, পট করে (তাড়াতাড়ি) মাত্রা উঠে যায়।

বাস্তবে চলার পথ সহজ করার জন্যই স্বপ্ন, আমি একটা লোককে বলেছিলাম, 'তুই এখানে জপ করবি না। স্বপ্নে জপ করবি।' সে আমার ফটো সামনে রেখে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জপ করে। রাত্রি দশটার সময় ঘুমিয়ে স্বপ্নের মধ্যে জপ করে। আমি স্বপ্নে তাকে বলেছি, 'তুই শিব দেখবি।' সে বলে 'তুমি যদি দেখাও, দেখবো।' শিব আসলো, বসলো। এসে বলে, 'কি নবদ্বীপ?'

পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তি সমস্ত ক্ষমতার মালিক হতে পারে যদি মনের আর মুখের কথা এক হয়ে যায়। স্বপ্নে মনের আর মুখের কথা এক হয় বলে, পট করে (তাড়াতাড়ি) মাত্রা উঠে যায়।

সে বলে, 'আমি কিছু জানি না। প্রভু বলে দিয়েছেন, তাই করছি'।

শিব বললো, 'তোর ভক্তি দেখে আশ্চর্য হলাম। তোমার জপে সন্তুষ্ট

হয়েছি। আরও বেশী কাজ কর'।

একদিন ঘুম থেকে উঠে এমন বসে পড়েছে যে, ওর (নবদ্বীপের) মনে হচ্ছে, যেন স্বপ্নেই আছে। একেবারে চরম অবস্থায় যখন যায়, তখন জেগে গিয়েও মনে হয়, স্বপ্নেই আছে। এরমধ্যে আবার তন্দ্রা এসে গেছে। স্বপ্নে একটা ষাঁড় তেড়ে আসছে। সে ঝট করে উপরে উঠে গেছে। আবার আস্তে আস্তে স্বাভাবিকভাবে নামছে। সবাই আশ্চর্য হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলে, 'কেন, কাল যে তোমাদের উপরে উঠিয়ে ছিলাম'। স্বপ্নের ঘটনা আর কি। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর ৯টার সময় ঘুম ভেঙ্গে গেছে। বেলা হয়ে গেছে। কই, কেউ তো ডাকলো না। একেক দেশের তাপ একেক রকম। বিহারে গেলে ১১৭°, বাংলায় ৯৫° একই সময়ে। বিশ্বপ্রকৃতির কোন কাজ এতটুকু বাইরে নয়। স্বপ্নে কোন জিনিসকে এত এগিয়ে দেয়, জাগ্রত অবস্থায় তা হয় না। ৫০ বছর ২১ ঘন্টা করে সাধনা করলে যে সফলতা আসবে, স্বপ্নে ১ সেকেন্ডে তা হয়ে যাবে। আমার মাষ্টার মশাইকে স্বপ্নে সাপে কামড়ে দিয়েছে, দেখে হাত লাল হয়ে গেছে। ওখানে (স্বপ্নে) Concentrate এত করেছে যে, 'মাগো, মাগো' করে জেগে উঠেছে। স্বপ্নে বেশী খেলে পেট খারাপ হয়। স্বপ্নে যে ওপরে ওঠে, জলের ওপর দিয়ে হাঁটে ঐ জায়গায় কোন দ্বন্দ্ব, কোন সমস্যা অর্থাৎ এখানকার আটকানোর কোন গিঁট থাকে না। স্বপ্নের মধ্যে ওটা (গিঁটটা) ছুটে (খুলে) যায়। স্বপ্নে যে উঠছে, তাতে যে মাত্রা থাকার তা হয়ে যায়। এটা ধরে রাখবার জন্য স্বপ্নের ধ্যান জ্ঞান রাখা দরকার।

স্বপ্নে কোন জিনিসকে এত এগিয়ে দেয়, জাগ্রত অবস্থায় তা হয় না। ৫০ বছর ২১ ঘন্টা করে সাধনা করলে যে সফলতা আসবে, স্বপ্নে ১ সেকেন্ড তা হয়ে যাবে।

সর্বদা জপ করতে বলি কেন? মনের হামাগুঁড়ি মন সবসময় দেবে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তুমি যা কর, মন কিন্তু খুটুর খুটুর করতাছে। স্বপ্নের ক্যামেরায় মনের সব হয়তো উঠে গেল। তুমি কখন যে আনমনে চিন্তা করেছ, নিজেই জানো না। কখন যে কোনটা উঠে যায়। ঐ যে কোন বন্ধুর বাসায় ১০ বৎসর আগে মূলা খেয়েছিলে; মূলা খাওয়া ক্যামেরায় (মনের)

স্বপ্নে কাজ (জপ) করলে পৃথিবীটা হস্তগত (অধীনে) হয়ে যাবে। সেই Speed-টা (গতি), Dream Speed-টা আবার সবচেয়ে বেশী। এত সুন্দর যে, ফুটে বের হয়ে যায়। স্বপ্নের আসন যোগের সবচেয়ে বড় আসন।

উঠে গেল। কোনদিন কার কাছে কোন অবস্থায় ছিলে, সে হয়তো এখন বিলেতে গিয়ে বসে আছে, সব উঠে যাচ্ছে। চিন্তার সাথে সাথে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মনের কাজ হয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নে শূন্যে দৌড়ায়, বাঘে দৌড়ায়, কোন ঠিক নাই। স্বপ্নে যে কি দেখবে। কাম (কাজ) করনা বলে স্বপ্নে দৌড়াদৌড়ি সার। ভিতরে Atomic Force-টা যদি Line-এ আনতে পারো তবেই হয়ে গেল। স্বপ্নে কাজ (জপ) করলে পৃথিবীটা হস্তগত (অধীনে) হয়ে যাবে। সেই Speed-টা (গতি), Dream Speed-টা আবার সবচেয়ে বেশী। এত সুন্দর যে, ফুটে বের হয়ে যায়। স্বপ্নের আসন যোগের সবচেয়ে বড় আসন।

স্বপ্নের আসনকে যোগের সবচেয়ে বড় আসন বলে কেন? কারণ আমরা সমাধির মাধ্যমে যাই। ঘুমটা একটা সমাধি। সমাধির পরই একটা দর্শন হয়। সমাধির পরই দর্শনের অবস্থা আসে স্বাভাবিকভাবে। এই যে ঘুমাচ্ছ, তাকিয়ে থেকে ঘুমাচ্ছ। সুন্দর তাকিয়ে আছো। চোরে বাতি জ্বলিয়ে দেখে যে, তাকে দেখছে। সে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। বুঝ কি অবস্থা। কান আছে শোনে না। চোখ আছে দেখে না। তবে কোন্ কান শোনে? কোন্ চোখ দেখে? আর একভাবে দেখছে শুনছে। সহজভাবে সহজগতির যে ধারা সেই ধারায় কাজ হয়ে যাচ্ছে। আমরা কোন্ পাত্রে খাচ্ছি? মুখ বন্ধ করে Injection দিয়ে যাচ্ছি। এমন খাওয়া কে চায়। আমরা না পেলাম মিষ্টির স্বাদ, না ঝালের স্বাদ। স্বপ্ন হচ্ছে মুখ। এই মুখ দিয়ে খেলে আমরা হাজার হাজার বৎসরের কাজ একদিনে করতে পারি। মুহূর্ত্তের মধ্যে হয়ে যায়। তোমাদের সামনে এত খাবার কিন্তু না খেয়ে পিত্তি পড়ে গেল। স্বপ্নের ভিতর যে আসন আছে, সেই আসনে আসন দাও। সন্ন্যাস বলে না তোমরা সব বনে চলে যাও। সমাধির পটে এখানকার সব ঘোলাটে ফেলে দাও। Blotting - এর ভিতর দিয়ে ঘোলাটে জল সুন্দর হয়ে যায়।

অনেকে বলে স্বপ্ন অলীক। স্বপ্নের কোন মাহাত্ম্য নেই। কিন্তু মাহাত্ম্য তার (স্বপ্নের) অনেক আছে, যদি কাজে লাগানো যায়। কাজে না লাগালে অলীক, মিথ্যা। ময়লাকে কাজে লাগালে ময়লা হতে Gass হয়। বাইরের ময়লা ঘৃণার বস্তু, যতক্ষণ না কাজে লাগে। কাজে লাগালে আলো পর্যন্ত জ্বালানো যায়। এই ক্লেদ ঘোলাটে যা কিছু আছে, সব সমাধির Blotting - এ ফেলে দাও। সব অন্যরকম হয়ে যাবে। আমার জল তেষ্টা পেয়েছে। 'ও' জল নিয়ে এসেছে ওর

অনেকে বলে স্বপ্ন অলীক। স্বপ্নের কোন মাহাত্ম্য নেই। কিন্তু মাহাত্ম্য তার (স্বপ্নের) অনেক আছে, যদি কাজে লাগানো যায়। কাজে না লাগালে অলীক, মিথ্যা। ময়লাকে কাজে লাগালে ময়লা হতে Gass হয়। বাইরের ময়লা ঘৃণার বস্তু, যতক্ষণ না কাজে লাগে। কাজে লাগালে আলো পর্যন্ত জ্বালানো যায়।

মধ্যে বেজে উঠেছে। কচ্ছপকে একবার খোঁচা দিলে এমন গুটিয়ে থাকে যে, আর বের হতে চায় না। এরকম করতে থাকলে না জাগালে কোনদিনই জাগবে না। সমাধির মধ্যে সাধক হাত, পা ছড়াতেই থাকে। এই যে নাকে লোম, কানে লোম দিয়েছে, কেন দিয়েছে? Germ তখনও সৃষ্টি হয় নাই। আগেই Protection-এর (রক্ষার) ব্যবস্থা করে রেখেছে। এই যে ভ্রু-তে লোমের ব্যবস্থা, চোখকে রক্ষা করার জন্য আগেই করে রেখেছে। এত যাঁর (স্রষ্টার) ব্যবস্থা, তাহলে কি স্বপ্নের ব্যবস্থা এমনি করেছে? স্বপ্নটা কি মিথ্যা? সেই আসনটা কি করেছে এমনি? সৃষ্টির নিয়মে যেদিক দিয়ে আসবে, সেদিক দিয়ে মিশবে। তবে, স্রষ্টাকে দেখা যাবে না।

এই ঘুম কতদিনের সঙ্গী। বাচ্চা বয়স থেকে ঘুমাইতে ঘুমাইতে চলছো। ঘুমাইতে কি ভাল লাগে। বাসায়, অফিসে, বাসে নাক ডেকে মনে হয় জীবন জুড়ায়ে গেল। ঘুম এত আরামের জিনিস, এটা কিসের জন্য? একি শুধু মিছামিছি? স্রষ্টা বলছেন, 'এই যে দিচ্ছি, তোরা মূল্য দিতে পারিস্ না।' কাজেই তোমরা Conscious থাকবে। তোমরা কি করবে? সুন্দর ধূপ জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে রইলে। জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছো। সকাল হয়ে গেল। তার পরদিন ফুট ফুট চলছে। যখন দেখবে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জপ চলছে, জেগে জপ করছো, আবার জপ করতে করতে ঘুমিয়ে রয়েছ। তখনও যদি খট খট চলে, তবে বুঝবে কিছুটা এগিয়েছ। একটা বাচ্চা আমার ম্যাসেজ করতো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমের চোখে তার বাবাকে ম্যাসেজ করছে। যাকে পায়, তাকেই ম্যাসেজ করতে থাকে। যাই হোক, এই যে চালু হয়ে গেছে, তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জপ করছো। কখন বসে পড়েছ, তারপর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখবে, জটাধারী

তোমরা কি করবে? সুন্দর ধূপ জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে রইলে। জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছো। সকাল হয়ে গেল। তার পরদিন ফুট ফুট চলছে। যখন দেখবে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জপ চলছে, জেগে জপ করছো, আবার জপ করতে করতে ঘুমিয়ে রয়েছ। তখনও যদি খট খট চলে, তবে বুঝবে কিছুটা এগিয়েছ।

ঘুমটা বড় সমাধি। তারচেয়ে মৃত্যু আরো বড় সমাধি। ঘুমটা সৃষ্টিরই একটা ইঙ্গিত। এই আভাষ, এই ঘুমটা যদি মৃত্যু না হয়, তবে মৃত্যুটাও মৃত্যু নয়।

সাধু এসেছে তোমার কাছে। আসবেই, কারণ যে Line-এ কাজ করছো, একে একে অনেকেই আসবে। তোমরা বুঝ বা না বুঝ, সুন্দর করে জপ চালিয়ে যাবে। হাত মুখ ধুয়ে টুয়ে, সুন্দর করে মশারি ফেলেই বিছানার আসনে বসবে; তারপর ঘুম পেলে শুয়ে পড়বে। কিছুদিন পরই এসে যাবে। কি করে আসবে? যেমনি করে খেলে রক্ত হয়। তেমনি করে এটা আস্তে আস্তে সুন্দরভাবে হয়ে যাবে। একেবারেই ভগবান হয়ে যাবে। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে যে পথ, এটা বড় পথ, মনে রেখো। ঘুমটা বড় সমাধি। তারচেয়ে মৃত্যু আরো বড় সমাধি। ঘুমটা সৃষ্টিরই একটা ইঙ্গিত। এই আভাষ, এই ঘুমটা যদি মৃত্যু না হয়, তবে মৃত্যুটাও মৃত্যু নয়। ৬০ বছরের ঘুমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে ঘুম গুলো পুঞ্জীভূত অবস্থায় ছিল, তাহা একদিনে ধাক্কা দিলে যে ঘুম হয়, সেই ঘুম আর ভাঙ্গে না। কাজেই মৃত্যু হয়।

একটা সরিষায় কিছু হয় না। অনেকগুলি সরিষায় তেল হয়। জীবনের সমস্ত ঘুমগুলো ঘুমাতে ঘুমাতে সাধনার পর একদিন যখন অনেকদিনের ঘুম এসে হাজির হয়, তখন সেই ঘুম থেকে আর জাগে না। পা কেটে ফেলে দিলেও টের পায় না। কারণ ঘুমের মাত্রাটা কিছু বাড়িয়ে দিয়েছে। এই যে সমাধি, এটা সবচেয়ে বড় সমাধি। মৃত্যুটা ঘুমেরই আর একটা অবস্থা। ঘুমটা প্রতিদিন আমাদের কাজে সহায়তা করছে। যেই জীবনের মধ্যে যেটা হবে, সেটা তোমাদের আগেই হবে। যা তোমরা চোখের সামনে দেখছো, তা তোমাদের জীবনে ঘটবে, সবই পাবে। মৃত্যু সমাধি যখন হয়, ঐ ৫০০০ - এর মাত্রা তুমি জাগ্রত অবস্থায় বসে থেকে সাধনায় ঐ মাত্রা আনতে পারবে। তুমি একঘর টাকা নিয়ে যেতে পার, আবার Cheque কেটে পকেটে নিয়ে যেতে পার। মৃত্যুর বোঝা তখনই বোঝা হয়, যখন লক্ষ টাকাকে পাই পয়সায় পরিণত করি। মৃত্যুরূপ সমাধি হল নির্বিকল্প সমাধি পূর্ণ সমাধি। তখন জলে দিলেও আচ্ছা, আগুনে দিলেও আচ্ছা। জাগ্রত অবস্থায় মৃত্যু হতে সেই মাত্রা নিয়ে যদি আমি নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করতে পারি, আমি এগিয়ে যেতে পারি। তখন জল স্থল সব সহজ হয়ে যাবে। কোন অবস্থায় আর চাওয়া নেই, পাওয়া নেই। সমাধির গভীর স্তরে সে মগ্ন। পচে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে, কঙ্কাল হয়ে যাচ্ছে, তার হুঁশ নেই।

জাগ্রত অবস্থায় মৃত্যু হতে সেই মাত্রা নিয়ে যদি আমি নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করতে পারি, আমি এগিয়ে যেতে পারি। তখন জল স্থল সব সহজ হয়ে যাবে। কোন অবস্থায় আর চাওয়া নেই, পাওয়া নেই। সমাধির গভীর স্তরে সে মগ্ন। পচে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে, কঙ্কাল হয়ে যাচ্ছে, তার হুঁশ নেই।

আমরা ঘুমকে বলবো 'তুমি ঘুমাও। আমাকে স্বপ্নে নিয়ে যাও।' স্বপ্নকে বলবো, 'তুমি আমার মাঝে স্বপ্রকাশে প্রকাশিত হও।' হনু যখন ১ সেকেন্ডে অনু হলো, স্বপ্নেও সেই মাত্রা ১ সেকেন্ডে এসে গেল। অনু হয়ে গিয়ে দেখতে লাগলো, অনেকে মরে গেছে। আবার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে, নিজেকেই নিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথে মায়ের স্তনে দুধ এসে যায়। কাজেই উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি নয়। ঘুমটা যেমন উদ্দেশ্য, যোগটা যেমন উদ্দেশ্য, মৃত্যুও তেমন উদ্দেশ্য। ইহা সমাধির শেষ অবস্থা; সেই চরম সমাধি। সেই সমাধির মাত্রাকে আয়ত্তে আনতে হবে। এই সমাধি দিয়ে ঐ সমাধিকে আয়ত্ত করতে হবে। ওতে কি পাবো? ঐ সমাধিতে যদি ঘন্টার পর ঘন্টা থাকি তবে সৃষ্টির পথটা, সৃষ্টির প্রকৃত নিয়মটার সহিত আমার সূত্র এক হয়ে যাবে। এইভাবে চলতে থাকলে ঐ প্রকৃতির প্রকৃত Line Chain হয়ে যাবে। একসূত্র যদি হয়ে যায়, এই যোগই তো যোগাযোগ। এই যোগে যদি চলে যাই, তখন পূর্ণ যোগ। এই পূর্ণযোগ যার আয়ত্ত হবে, সে তখনই পূর্ণ হবে। সমস্ত অপূরণ বস্তুকে সে পূরণ করবে। পূর্ণ হয়েই পূর্ণের সঙ্গে মিলবে। তার সূত্রটা এখান থেকেই শুরু হয়। তখন এখানে Individual বা আলাদা ব্যক্তিগত বোধ থাকে না। আপন বোধের সাথে বিশ্ববোধে ভরপুর হয়ে পূর্ণ সমাধিতে লীন হয়ে যায়। একেই বলে নির্বিকল্প সমাধি, যার ভিতরে কিছুই থাকে না, আবার সবই থাকে। দৈনন্দিন স্বপ্ন কেউ যে দেখে না, তা নয়। স্বপ্ন যে দেখে না, কয়েকদিন চেষ্টা করলে সেও দেখবে। পরে বেশ সুন্দর সহজ হয়ে যাবে। তোমাদের এই নিদ্রা সমাধি, এই সহজ যোগ, প্রকৃতির এত সহজ পথ আর নেই। এই যে প্রতিদিনের ঘুম, এটাকে কাজে লাগাও। এটাকে কাজে লাগাও। এটা যোগ প্রক্রিয়ায় অতি মহৎ কাজ। এটাকে শেষ করে দিও না। আজ এই থাক।

তখন এখানে Individual বা আলাদা ব্যক্তিগত বোধ থাকে না। আপন বোধের সাথে বিশ্ববোধে ভরপুর হয়ে পূর্ণ সমাধিতে লীন হয়ে যায়। একেই বলে নির্বিকল্প সমাধি, যার ভিতরে কিছুই থাকে না, আবার সবই থাকে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

শুধু মৃত্যুর পরই নয় জীবন্ত অবস্থায়ও আত্মা ক্রমশঃ ক্রমশঃ বেরিয়ে যায়

০৯-১১-১৯৬৮ (ভুপেন বোস এ্যাভিনিউ, কোলকাতা)

আত্মা কি, আগে তা ভাল করে বুঝতে হবে, জানতে হবে। সৃষ্টির পিছনে একটা অতি-সচেতন কিছু আছে বলেই প্রকৃতির সর্বত্র সবাই এত সচেতন। এই যে সচেতনতা, এই যে চৈতন্য, এটাই আত্মা। আত্মার সত্তা আছে, মন আছে, বুদ্ধি আছে, কিন্তু খুঁজতে গেলে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আকাশ যেমন অসীম। তার নীল বর্ণকে যেমন বর্ণনায় আনা যায় না, আত্মার রূপও তেমনি বর্ণনা করা যায় না। প্রতিটি বস্তুর বস্তুত্বের মাঝে, খোঁজের মাঝে নিখোঁজ হয়েই তার পূর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে আত্মা বিরাজমান। তাই আত্মাকে জানা যায়, বুঝা যায় কিন্তু দেখা যায় না। বাতাসকে দেখতে পাও? কিন্তু অনুভব করতে পার। দেখতে পাও না বলে বাতাসের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে তো পার না। নিদাঘের রাগে নদী, নালা, খাল, বিল, সাগর, মহাসাগরের জল উত্তপ্ত বাষ্পরাশিরূপে উর্দ্ধমুখী হয়ে যখন জমতে থাকে মহাশূন্যে মহাকাশে, কয়েক সাগরের জল যে মহাকাশে জমা হয়ে রইল বুঝা কি যায়? কিন্তু যখন ঢালতে থাকে পৃথিবীর বুকে বৃষ্টির ধারায় ধারায় অজস্র বর্ষণে, তখন বুঝা যায়।

সৃষ্টির পিছনে একটা অতি-সচেতন কিছু আছে বলেই প্রকৃতির সর্বত্র সবাই এত সচেতন। এই যে সচেতনতা, এই যে চৈতন্য, এটাই আত্মা।

সাগর হতে যখন জল আসে, তখন সব জলের স্বাদই নোন্‌তা। সেই জলই আবার যখন নদ-নদীতে যায়, তখন জলের নোন্‌তা ভাব আর থাকে না। সেই মিঠা জলই আবার যখন সাগরে গিয়ে পড়ে, তখন নোন্‌তা লাগে। তেমনি জীবের আত্মাগুলো, এই খন্ড খন্ড চৈতন্যগুলো যখন মহাকাশের শূন্যগর্ভে একাকার হয়ে এক অখন্ড মহাচৈতন্যরূপে বিরাজিত অবস্থায় বিরাজ করে, তখন সেগুলো সব শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। সেই আত্মাই আবার যখন বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন নামকরণে দেহ গ্রহণ করে তখন বিভিন্ন খাদ নিয়ে জন্ম

তেমনি জীবের আত্মাগুলো, এই খন্ড খন্ড চৈতন্যগুলো যখন মহাকাশের শূন্যগর্ভে একাকার হয়ে এক অখন্ড মহাচৈতন্যরূপে বিরাজিত অবস্থায় বিরাজ করে, তখন সেগুলো সব শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত।

নেয়। তাইতো জীবের আকৃতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন ধরণের।

মৃত্যুর পর আত্মা বা চৈতন্যের কণিকাগুলো আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে গিয়ে সেখানে বিরাজিত অবস্থায় বিরাজ করতে থাকে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ স্তরে স্তরে সেই আত্মাই আবার দেহধারণ করে। এভাবে আত্মাই দেহ নিয়ে এই জীবজগৎসৃষ্টি করে। আত্মার সেই সূক্ষ্ম অবস্থা হতেই এসেছি সবাই রক্ত বীর্যের ধারায়। সেই সূক্ষ্ম অবস্থা আজও এই দেহে বিদ্যমান। একদিন আলো ও বাতাসের অণুপরমাণুর চেয়েও সূক্ষ্ম অবস্থায় অনন্ত মহাকাশে ছিলাম সবাই। সেই সূক্ষ্ম অবস্থা হতেই রক্ত বীর্যের মাধ্যমে এসেছি এই স্থূল দেহে।

অজস্র অজস্র অণুপরমাণু নিয়েই এই দেহ তৈরী। তার প্রতিটিতেই চৈতন্য আছে, আত্মা আছে। মহাকাশের যে মহাচৈতন্য সেই সচেতনতাটা জমাট হলেই আত্মা হয়। ফুলটা ফুটেছে আর তার গন্ধ চলে গেছে কতদূরে। এই যে গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে ফুল থেকে, একটা সূক্ষ্ম কোন বস্তু বের না হয়ে গেলে গন্ধটা কি করে সেখানে যায়? ফুলের সুগন্ধের ন্যায় দেহের সুগন্ধ হচ্ছে মন। শুকনো ফুলের ন্যায় মৃত্যুর পর দেহটা এখানে পড়ে থাকে আর দেহের নির্যাস রূপ মনটা আলো বাতাসের সাথে মিশতে মিশতে চলে যায়। মোটরগাড়ি যখন চলে, Engine-টা তাকে চালিয়ে নেয়। কিন্তু Engine-টা থামিয়ে দিলেও সেই গতিতে, গাড়িটা আরও কিছুদূর এগিয়ে যায়। সেইরকম মৃত্যুর পর দেহ যখন অচেতন হয়ে পড়ে থাকে, তখন দেহের Engine বন্ধ হলেও তার গতিতে আত্মাটা আলো বাতাসের সাথে মিশতে মহাশূন্যে চলে যায়। আর যে জল, বাতাস, আগুন, মাটি দিয়ে দেহ তৈরী, মৃত্যুর পর দেহটা তার সাথে মিশতে থাকে। জলের অণু জলে যায়, তাপের অণু তাপে যায় - সব অণুপরমাণু ছড়িয়ে পড়ে, ইন্দ্রিয়গুলো সব ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

ফুলটা ফুটেছে আর তার গন্ধ চলে গেছে কতদূরে। এই যে গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে ফুল থেকে, একটা সূক্ষ্ম কোন বস্তু বের না হয়ে গেলে গন্ধটা কি করে সেখানে যায়?

দেহ থেকে তার নির্যাসরূপ মনটা যে বেরিয়ে যায়, এটা শুধু মৃত্যুর পরই বের হয় না। ফুলের গন্ধ বেরিয়ে যেতে যেতেই যেমন ফুলটা ক্রমশঃ শুকিয়ে যায়, তেমনি দেহের সুগন্ধও অনবরত বেরিয়ে যাচ্ছে বলেই দেহটা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে, শেষে দেহটা লয় ক্ষয় হয়ে যায়। এই যে বেরিয়ে যাচ্ছে তার

মানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুপরমাণুর আকারে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এই সুগন্ধরূপ মন অনর্গল বেরিয়ে না গেলে সবাই আমরা চিরদিন বেঁচে থাকতাম এখানে। আত্মা বা চৈতন্যটা কি করে? এতটুকু জল যেমন অসংখ্য বালুকণাকে একত্র ধরে রাখে, তেমনি মন বা চৈতন্যও দেহের সকল অণুপরমাণু, সকল ইন্দ্রিয়কে টেনে টেনে যার যার জায়গামত রেখে দেয়। তাইতো দেহ টিকে থাকে। তা না হলে মৌচাকের মৌমাছিদের মত দেহটাও উড়ে যেত।

ফুলের গন্ধ বেরিয়ে যেতে যেতেই যেমন ফুলটা ক্রমশঃ শুকিয়ে যায়, তেমনি দেহের সুগন্ধও অনবরত বেরিয়ে যাচ্ছে বলেই দেহটা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে, শেষে দেহটা লয় ক্ষয় হয়ে যায়।

গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে, মৃত্যুর পর কি যে বেরিয়ে যাচ্ছে, কিভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে, প্রত্যক্ষভাবে তা কারও জানা নেই। আমাদের মাথার উপরে কয়েক সাগরের জল আকাশের সাথে এমনভাবে মিশে রয়েছে যে, খুঁজতে গেলে সবই ফাঁকা। কিন্তু ২/৩ দিনের বৃষ্টিতে সেই জলেই আবার নদনদী সাগর সব ভরে যায়, গোটা দেশ ভেসে যায়। আমাদের আত্মাও সাগরের মতই বিরাট ও ব্যাপক। জলের মত সেও বেরিয়ে যায়, মিশে যায় আকাশে বাতাসে ঠিক যেমন করে নিদাঘের রাগে লোকচক্ষুর অন্তরালে জল বাষ্প হয়ে চলে যায় আকাশে বাতাসে। এই যে বলা হয় মৃত্যুর পরই বেরিয়ে যায় আত্মা, শুধু মৃত্যুর পরই আত্মা বেরিয়ে যায় না। জীবন্ত অবস্থাতেই ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেহের সচেতন পদার্থ, আত্মা নামে যা অভিহিত, বায়ু ও তেজের মিলনে যা রয়েছে, ঠিক বাষ্পের মত বের হয়ে যায়। তাকে দেখা যায় না। যার দেহ হতে বেরিয়ে যায়, প্রথমে সেও কিছুই বোঝে না। কিন্তু বুঝতে পারে দেহ যখন ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে আসে। এই যে শৈশব থেকে কৈশোর ও যৌবনের ভিতর দিয়ে সবার দেহের ও মনের পরিবর্তন হচ্ছে, তার সাথে সাথে আত্মারূপ চৈতন্যের অনুপরমাণুগুলোও সদাসর্বদা বেরিয়ে যাচ্ছে দেহ ও মন থেকে। কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘের মত আত্মা ক্রমশঃ ক্রমশঃ বের হয়ে যাচ্ছে বলেই দেহ ক্ষণস্থায়ী। তাইতো কেউ চিরদিন এখানে থাকতে পারেনা।

এই যে বলা হয় মৃত্যুর পরই বেরিয়ে যায় আত্মা শুধু মৃত্যুর পরই বেরিয়ে যায় না। জীবন্ত অবস্থাতেই ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেহের সচেতন পদার্থ, আত্মা নামে যা অভিহিত, বায়ু ও তেজের মিলনে যা রয়েছে, ঠিক বাষ্পের মত বের হয়ে যায়।

চৈতন্যরূপী আত্মা দেহের আড়াল হয়ে গেলে এই দেহ আর নড়াচড়া করে না, কথা বলে না। দেহের সাথে তার আর কোন সম্পর্কই থাকে না। কিন্তু আকাশে বাতাসে জলে মাটিতে - সর্বত্রই তার সম্পর্ক থাকে পূর্ণভাবে। কারণ এইসব শূন্যের বিষয়বস্তু হতেই তো চৈতন্য।

দুই মণ ওজনের একটি কর্পূরের মূর্তির সামনে বসে সাধক সাধনা করছে। হঠাৎ দেখে মূর্তি নেই, অদৃশ্য হয়ে গেছে। কর্পূরের মত আরও অনেক বিষয়বস্তু আছে, যা ক্রমশঃ ক্রমশঃ মিশে যায়। আমাদের দেহের নানা বস্তুও এভাবেই একটু একটু করে মিশে যায়, অদৃশ্য হয়ে যায়। সকল বস্তুই চলে যাচ্ছে এভাবে যার যার স্তরে, যার যার মাত্রায় মাত্রায়। স্রোতের মতই সব চলে যাচ্ছে, অথচ কখন যাচ্ছে, কিভাবে যাচ্ছে, কি যাচ্ছে, বুঝা যায় না। যেভাবে মহাশূন্য থেকে চৈতন্যের কণিকাগুলো ভাসতে ভাসতে এসে জমাট বেঁধে রূপ নেয় এখানে, বেরিয়ে চলে যাবার পরও আবার সুযোগ পেলে তারা সেভাবেই জমাট বেঁধে নতুন দেহ ধারণ করতে পারে। মৃত্যুর পর দেহের এই যে প্রকাশ, এটা হচ্ছে যেন কোন ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে, আবার স্বপ্নে অন্যত্র গিয়ে দৌড় ঝাঁপ করছে, কথা বলছে। স্বপ্নের ভিতরও তার বুঝ ঠিকই আছে। কারণ ঘুম থেকে জেগে উঠে সে স্বপ্নের কথা ঠিকই বলতে পারছে। এই যে স্বপ্ন, এটা হচ্ছে ঘুম রূপ মৃত্যুর স্তর পার হয়ে আত্মার আরেকটি রূপের প্রকাশ। স্বপ্নে মনটা যেভাবে থাকে, মৃত্যুর পরও আত্মা সেভাবেই থাকে।

সকল বস্তুই চলে যাচ্ছে এভাবে যার যার স্তরে, যার যার মাত্রায় মাত্রায়। স্রোতের মতই সব চলে যাচ্ছে, অথচ কখন যাচ্ছে, কিভাবে যাচ্ছে, কি যাচ্ছে, বুঝা যায় না।

আত্মাটা হচ্ছে একপ্রকার জীবন্ত Photo বিশেষ। ঠিক তোমারই মত সবকিছু নিয়ে একটি Record হয়ে যাচ্ছে। তার রূপ আছে। সে কথা বলে। প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়। শুধু আমাদের এই দেহেই নয়, প্রতি বস্তুতেই অতি সূক্ষ্মাক্ষরে সচেতন বস্তুগুলো সুসজ্জিত রয়েছে। সবারই তাই বুঝ আছে, চৈতন্য আছে, বুদ্ধিবৃত্তি আছে। চৈতন্যের এই অণুপরমাণুগুলো এত সূক্ষ্ম যে, তারা অনায়াসে দেওয়াল ভেদ করে যেতে পারে। সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের মত ঐ কণিকাগুলোও জোনাকি পোকার মত জ্বলে উঠছে।

চৈতন্যের এই অণুপরমাণুগুলো এত সূক্ষ্ম যে, তারা অনায়াসে দেওয়াল ভেদ করে যেতে পারে।

মৃত্যুর পর কাউকে পুড়িয়ে দেওয়া হল, সে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তার যে জীবন্ত Photo দেহ থেকে বেরিয়ে চলে গেল, সে আবার কথা বলতে শুরু করলো। কারণ তার জীবন্ত Record তো রয়েছে আকাশে বাতাসে।

চৈতন্যের সেই কণিকাগুলোই আমাদের এই দেহের মাঝে ভরপুর হয়ে আছে। আবার আমরা ভরপুর হয়ে তাকিয়ে আছি আকাশপানে, যার সীমা খুঁজে পাওয়া যায় না। একই সূত্রধারার ধারায় রয়েছে এই ধারা। জল যেমন বাষ্প হয়ে চলে যায়, কর্পূর যেমন উড়ে চলে যায়, সেই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সতেজ অণুপরমাণুগুলোও সেভাবেই মনের টানে মনের ধারায় সর্বাবস্থায় আকাশমুখী হয়ে তোমার সত্তা নিয়ে, তোমার জীবন্ত Photo নিয়ে চলে যাচ্ছে। Lense-এর চেয়ে ওদের টানবার ক্ষমতা অনেক বেশী বলেই জীবন্ত Photo Record করে নিতে পারে ওরা অতি সহজেই। মনে কর, মৃত্যুর পর কাউকে পুড়িয়ে দেওয়া হল, সে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তার যে জীবন্ত Photo দেহ থেকে বেরিয়ে চলে গেল, সে আবার কথা বলতে শুরু করলো। কারণ তার জীবন্ত Record তো রয়েছে আকাশে বাতাসে। সে আবার একটা দেহ ধারণ করেছে। একই জিনিস, একই বস্তু-একইভাবে গড়া। এই যে চৈতন্যের কণিকাগুলো আমাদের সবার মধ্যে রয়েছে, তারা সবসময় আমরা কি করছি, কি বলছি, কি চিন্তা করছি, তার জীবন্ত Photo তুলে নিচ্ছে। সব কিছু নিয়ে তারা আবার আকাশের বুকে বরফের মত জমাট হয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুতো তাই মৃত্যুর বহু আগে থেকেই শুরু হয়ে যায়। শেষে একদিন এই দেহযন্ত্রটি যখন শেষ নিঃশ্বাস ফেলে দিল, তখন দেখা গেল সেই ব্যক্তি উপরে গিয়ে দেহ নিয়ে বসে আছে। সবারই এভাবে মৃত্যুর পর দেহধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে। তবে যে পারে না, তার কারণ এখানে আমাদের মনে এত রকমারি চিন্তা ভাবনা চলছে যে, কোন চিন্তাই অন্য কারও সাথে মিলতে পারছে না। মিলতে পারছে না বলেই চিন্তাগুলো জমাট বেঁধে রূপ গ্রহণ করতেও পারছে না। এর জন্যই নাম ও জপের ব্যবস্থা।

সমস্ত চেতন ও সচেতন বস্তুগুলো, আত্মা নামে যাকে অভিহিত করা হয়েছে, বাতাসের মত ধারাবাহিক এগিয়ে যাচ্ছে যার যার স্তর, যার যার ভিন্ন ভাবের ভিতর দিয়ে। আজও যে তারা একইভাবে চলছে এগিয়ে, তার প্রমাণ যারা বাস্তবে থেকে কথা বলছে, দেখছে, শুনছে, তাদের ভিতর কে যে দেখছে, শুনছে বা

সবারই এভাবে মৃত্যুর পর দেহধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে। তবে যে পারে না, তার কারণ এখানে আমাদের মনে এত রকমারি চিন্তা ভাবনা চলছে যে, কোন চিন্তাই অন্য কারও সাথে মিলতে পারছে না।

স্বাদ পাচ্ছে, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খুঁজতে গেলে শুধুই মাংসপিন্ড, শিরা-উপশিরা আর অস্থি ছাড়া কিছুই নেই। এই যে তোমরা কথা বলছো, কে বলছে, তাকে তো কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এই দেহে থেকেই তো আত্মা অদৃশ্য হয়ে রয়েছে। আত্মাতো এখানেই মিশে রয়েছে। কিন্তু মিশে থাকার অবস্থায় থেকেও আত্মা তোমাদের সাথে তার অন্তরের আত্মীয়তা ও ভালবাসার সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। চোখের আড়ালে থেকেও দেহের সাথে সে মিশে রয়েছে বলেই তোমরা সবাই নড়াচড়া করছো, কথা বলছো। এমনিভাবে আত্মা রয়েছে সর্বত্র। কিন্তু খুঁজতে গেলে আকাশে বাতাসে শূন্যের পর শূন্য ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

আত্মা হচ্ছে আকাশের মত ব্যাপক। তার সীমা খুঁজে পাওয়া যায় না। এই যে চৈতন্য সর্বত্র যা বিরাজমান সেটাই হল আত্মার স্বরূপ। এরই প্রতীক হচ্ছে সূর্য। আর সেই সূর্য বা তেজের সন্তান হচ্ছে জীবজগতের যা কিছু। একটা সত্তারই সত্তা সবাই, একটা সুরেরই সাড়া। তাই একটাই আত্মা। সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সব একই চৈতন্যের কণিকাপুঞ্জ। সকল তেজ কণিকা মিলেই হল আত্মা। সব মিলে একটা বোধেরই সাড়া রয়েছে প্রতি বস্তুতে। তাই একটা সুরই দেবে সবাই। হাজার Radio একই মাত্রায় বাঁধা থাকলে একটা সুরই দেবে। রূপ ও গুণের পার্থক্য থাকলেও সবাই তাই একটা সুরের সাড়াই দেবে। দেহের বিভিন্ন অংশের চেহারা আলাদা, ক্ষমতা আলাদা, কাজ ও আলাদা। কিন্তু সবাই মিলে একটা বোধকেই বোধগম্য করছে। সেটাইতো আমার আমিত্ব বা চৈতন্য সত্তা। সেটাই আবার আত্মা নামেও অভিহিত। অগণিত কণিকা নিয়েই এই দেহ। আর তার প্রতিটিতেই রয়েছে একই সত্তা, একই আত্মা। আত্মা নিজেকে নিজে জেনে জ্ঞানে ভরপুর হয়ে নিজেই নিজেকে প্রকাশ করছে। আত্মজ্ঞানের বিভোরতায় আত্মস্থ হয়ে ধাপে ধাপে যে জ্ঞানের বিকাশ ও প্রকাশ হয়, সেই প্রকাশিত বস্তুই হচ্ছে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। তাই এই জগৎটাই হচ্ছে আত্মার রূপ।

আত্মা হচ্ছে আকাশের মত ব্যাপক। তার সীমা খুঁজে পাওয়া যায় না। এই যে চৈতন্য সর্বত্র যা বিরাজমান সেটাই হল আত্মার স্বরূপ। এরই প্রতীক হচ্ছে সূর্য। আর সেই সূর্য বা তেজের সন্তান হচ্ছে জীবজগতের যা কিছু।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

বিদেহীর আর্তনাদ

১৭-০৫-১৯৮৯
লেকটাউন, কোলকাতা

আমার (শ্রীশ্রীঠাকুরের) মেসোমশাই ঁকৃষ্ণ প্রসন্ন সপ্ততীর্থ ছিলেন বিরাট পন্ডিত এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক ব্যক্তি। তিনি কয়েকদিন ধরে দেখছেন, এক মহিলা ঘোমটা মাথায় দিয়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে। পাশের বাড়ীতে আমার সম্পর্কে এক মামী থাকতেন। মেসোমশাই তাকে বৌঠান বলে ডাকতেন। মেসোমশাই বারে বারে তামাক খেতেন। তিনি তামাক খাচ্ছেন। সে ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া রইছে, সন্ধ্যার সময়। মেসোমশাই বলছেন, 'কি বৌঠান, শেষবেলা বুড়াবয়সে কি রস করতাছেন নাকি? এখানে ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া রইছেন?' কথাবার্ত্তা কয় না। মন্ডপ ঘর আছে। সেখানে তামাক খাচ্ছেন। ঐখানে গিয়া দাঁড়াইছে। মেসোমশাই বলেন, 'বৌঠান, আরম্ভ করছেন কি আপনে? আমার পিছে পিছে এরকমভাবে ধাইছেন কেন?' কথা কয় না।

মেসোমশাই বলছেন, 'কি বৌঠান, শেষবেলা বুড়াবয়সে কি রস করতাছেন নাকি? এখানে ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া রইছেন?' কথাবার্ত্তা কয় না। মন্ডপ ঘর আছে। সেখানে তামাক খাচ্ছেন। ঐখানে গিয়া দাঁড়াইছে।

তারপরে ক্ষেতের কাছে মেসোমশাই এমনি গিয়া বইছেন তামাক টামাক নিয়া। সেখানেও গিয়া দাঁড়াইছে। এইখানে তো বৌঠানের আসার কোন কারণ নাই। তখন মেসোমশাইয়ের টনক নড়ছে।

মেসোমশাই বলতাছেন, 'আপনাকে বৌঠান বলেছি। আপনি কে বলুন তো? ঘোমটা দিয়া আমার কাছে দাঁড়াইয়া থাকেন। বেশ কিছুদিন যাবৎ আপনি আমাকে জ্বালাতন করছেন। আপনি কে বলুন তো? মুখটা আমাকে দেখান? আমি দেখি, আপনাকে চিনি কি না?' ঘোমটাটা উঠাইছে। ঘোমটা উঠাইতে দেখে মেসোমশাইয়ের পিসীমা। মাথায় একটু ইয়ে (দোষ) আছিল। জলে ডুইবা মরছিল। বুঝলে? মেসোমশাইর লগে দেখা হইল ৩৭ বছর পরে।

ঘোমটাটা উঠাইছে। ঘোমটা উঠাইতে দেখে মেসোমশাইয়ের পিসীমা। মাথায় একটু ইয়ে (দোষ) আছিল। জলে ডুইবা মরছিল। বুঝলে? মেসোমশাইর লগে দেখা হইল ৩৭ বছর পরে।

পিসীমা, আপনি এখনও এইভাবে পড়ে আছেন? মেসোমশাই চেঁচিয়ে বলে ওঠেন। চুপ কইরা ছলছল চোখে তাকাইয়া রইছে।

আমি ওদিকে ছিলাম না। আমি গেছি মেসোমশাইর কাছে। শেষবেলা করছে কি, আঙুল দিয়া আমারে দেখাইয়া দিছে। মেসোমশাই বুইঝা নিছেন। তারপর তিনি আমারে বলছেন।

আমি বলছি, আস। এক ঘটি জলের মধ্যে তিনটা আঙুল চুবাইয়া দিছি। তারপর মেসোমশাইরে বলছি, আবার যখন আসবে, এই জল ছিটাইয়া দিও।

এক ঘটি জলের মধ্যে তিনটা আঙুল চুবাইয়া দিছি। তারপর মেসোমশাইরে বলছি, আবার যখন আসবে, এই জল ছিটাইয়া দিও।

ঠিক, আবার যখন আসছে, মেসোমশাই জল ছিটাইয়া দিছেন। হাসতে হাসতে চইলা গেছে।

মেসোমশাই বলছেন, তোমার আঙুলে ছোঁয়ানো জলের ছিটার দাম কত। মেসোমশাই বলছেন আর অবাক হয়ে আমাকে দেখছেন।

আমি বললাম, দৈবজ্ঞ ব্যক্তির স্পর্শে যে কোন আত্মার মুক্তি হতে পারে। একটু আঙুলের ছোঁয়ায়, সেই জলের ছিটায় হাসতে হাসতে চলে গেল খুশী হয়ে। সে খুশী চিত্তে চলে গেল।

এইরকমভাবে আত্মাগুলো আসতে থাকে। ক্ষমা চাইতে আসতে থাকে। দুঃখ জানাইতে আসতে থাকে, উপায় নাই। আমাদের আইনে নিয়ম আছে, যারা Suicide (সুইসাইড) করবে, তাদের উপরে নজর দিবা না। তাদের কৃপা করা নিষেধ। আমি যদি নজর দিতে যাই, রেকর্ডটা খারাপ হইয়া যাবে। তাইলে মুক্তির রাস্তা নাই। আবার যদি জন্ম হয়, ভাল কাজ করতে পারে তখন। আত্মা চলে গেলে, তারপর ঐখানে গিয়ে সাধনা করলে হবে না। তাহলে তো জন্মই হতো না। আত্মাগুলো চলে গেলে (মরে গেলে) ওখানেই সব সাধনা করতো।

আমাদের আইনে নিয়ম আছে, যারা Suicide (সুইসাইড) করবে, তাদের উপরে নজর দিবা না। তাদের কৃপা করা নিষেধ। আমি যদি নজর দিতে যাই, রেকর্ডটা খারাপ হইয়া যাবে।

জন্ম হয়ে মৃত্যুর পর ৭০ কোটি, ৮০ কোটি বছর পর মনে কর, একেকজন মহান অবতার তুল্য হয়ে গেছে। প্রকৃতির থিকাই (থেকেই) বলে, 'তুমি কি জন্ম নিবা?' সামনে একটা বিরাট Post আছে, Promotion আছে। তারা (মহানরা) বেশ ভাল ভাবেই আছে। বুঝলা? প্রকৃতি থেকেই বলছে, এই Post টা যদি চাও, তাহলে জন্ম নিতে হবে। নিতে পার।'

তখন যদি বলে, 'হ্যাঁ জন্ম নেব। এই Post টা আমার চাই।' তখন তাদের জন্মের লাইনে ফেলাইয়া দিব। জন্ম নিল। জন্ম নিয়া ঐ Post টার জন্য যে জন্ম নিছে, ঐটা মনে রইল, বুঝছো? তারা দেহের অধীন হইয়া গেল। দেহের মধ্যে অন্তর্যামিত্বের দরজা বন্ধ থাকে; সব দরজা বন্ধ হইয়া গেল। জন্মের পর আইসা বসছে। তখন চিন্তা কইরা কইরা বাইর (বের) করতে থাকে, আমি তো এই Post টার জন্য আসছি। এই Post টা পেতে হলে আমাকে তো এই এই আইনগুলো মেনে চলতে হবে। বিরাট Post. এই Post টা পেতে হলে এতগুলো আইন যদি মেনে চলতে পারি, তবেই প্রকৃতির তরফ থেকে এই Post-টা পেতে পারি। সুতরাং সেইভাবেই কাজ করতে হবে। যে পারে না, তার Slip হইয়া গেল গিয়া। নষ্ট হইয়া গেল। সে তখন কি করবে? আগের Post-এ যাবে গিয়া। কোন অসুবিধা নাই। এই Post - টা পাইল না।

জন্ম নিয়া ঐ Post টার জন্য যে জন্ম নিছে, ঐটা মনে রইল, বুঝছো? তারা দেহের অধীন হইয়া গেল। দেহের মধ্যে অন্তর্যামিত্বের দরজা বন্ধ থাকে; সব দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

এই আত্মার কতরকম কতকিছু। আজ কোটি কোটি বছর ধরে এই আত্মার বিষয় নিয়ে বিব্রত হয়ে যাচ্ছে সব। কি করা যায়? কোটি কোটি আত্মা চলছে এই স্রোতের মাঝে। কত লোকের সঙ্গে দেখা হবে। স্রোতের মতন ভেসে উঠছে মশার আত্মা, মাছির আত্মা, মাছের আত্মা। সব স্রোতের মাঝে চলছে। কত লোকের আত্মা দেখবা। পরিচয় হইয়া গেছে গিয়া। 'আরে আরে আপনি আইসা পড়ছেন? কবে মারা গেলেন আপনি? কথা বুঝলা? জেলের মধ্যে গিয়া পাঁচজনের লগে দেখা হইল আর কি।

কোটি কোটি আত্মা চলছে এই স্রোতের মাঝে। কত লোকের সঙ্গে দেখা হবে। স্রোতের মতন ভেসে উঠছে মশার আত্মা, মাছির আত্মা, মাছের আত্মা। সব স্রোতের মাঝে চলছে। কত লোকের আত্মা দেখবা। পরিচয় হইয়া গেছে গিয়া।

— কবে মারা গেলেন?

— এই তো এগার বছর আগে মারা গেছি।

— জন্মে যখন জীবিত অবস্থায় আছিলেন, তখন কি বুঝছিলেন?

— তখন তো বুঝি নাই। তখন তো ছল চাতুরী, মিথ্যা প্রবঞ্চনা সবই করেছি। এখন তো ছিদ্যৎ পোহাইতেছি। কবে আবার জন্ম হইব, তাও জানি না। আর এই যে স্রোতে ঘুরতাছি, একেবারে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ঘুরতাছি। কিছুই তো টের পাইতাছি না। দেখতাছি, সবাই ঘুরতাছে। এখানে সবাই আমাদের মতই অবুঝ হইয়া ঘুরতাছে। আমরা যেমন অবুঝ আছিলাম। বুঝের কথা কত শুনছি। শুইনাও কিছুই বুঝি নাই।

ঐভাবে ঘুরতে ঘুরতেই আরেকজন কইতাছে, তাইতো, এই ৮০/৯০-টা বছর আমরা কিভাবে নষ্ট করছি। এই ৮০টা বছর যদি আমরা একটু কাজ করতাম। তাইলে তো এইভাবে ঘুরতাম না। এত কষ্ট পাইতাম না। সেই কারণেই মৃত্যুটা দিয়ে দিয়েছে অল্প সময়ের জন্য। বুঝছো তো? অল্প সময়ের মধ্যে Course Complete করার ক্ষমতাও তোমায় দিয়ে দিয়েছে। একটা Course Complete কর

বুঝছো তো? অল্প সময়ের মধ্যে Course Complete করার ক্ষমতাও তোমায় দিয়ে দিয়েছে। একটা Course Complete কর না তোমরা? এই বইটার Course Complete করতে হবে দুই বছরের মধ্যে। এই ৮০ বছরের মধ্যে এই Course Complete করতে যাতে পারা যায়, এই ক্ষমতাও Nature দিয়া দিছে আমাদের।

না তোমরা? এই বইটার Course Complete করতে হবে দুই বছরের মধ্যে। এই ৮০ বছরের মধ্যে এই Course Complete করতে যাতে পারা যায়, এই ক্ষমতাও Nature দিয়া দিছে আমাদের। সেই ক্ষমতা দিয়া আমরা কি করেছি? আমরা হিংসা করেছি, রাগ করেছি, মান অভিমান করেছি, নানারকম ছল চাতুরী করেছি, নানাভাবে নষ্ট করেছি, অপচয় করেছি। বাবার দেওয়া অর্থ আমি অপচয় করেছি। প্রকৃতির মহাদান ইচ্ছাকৃতভাবে স্বেচ্ছায় অপব্যবহার করে আমি একেবারে রসাতলে গেছি। মৃত্যুর পরে ঐগুলো সব আমার সাথী। সাথী হইয়া এক্কেবারে আমারে শেষ কইরা দিছে। মর মর। এইখানে মরণ নাই। কিন্তু যন্ত্রণা আছে, অনুশোচনা আছে। এ এক দুঃসহ অবস্থা, আত্মাগুলি কইতাছে।

কোটি কোটি স্তর আছে। যেমন জলের স্তর আছে, বায়ুর স্তর আছে, এখানেও তেমনি প্রত্যেকটির মাত্রা আছে, স্তর আছে। যেমন একেকটির ১মাত্রা, ২মাত্রা, ২১/২ মাত্রা, ৩ মাত্রা ইত্যাদি। মাত্রা ভেদ আছে যার যার। যে যেমন Status নিয়া যাবে, Status-এর tune (সুর) নিয়া যাবে, সম্বল নিয়া যাবে সহজকথা, সেই সম্বল অনুযায়ী মাত্রা হইয়া যায়। ঐ মাত্রা অনুযায়ী স্তর হইয়া গেল, লাইনে গিয়া পড়লো। দেখা গেল, এই স্তরে মশা হবে। মশায় চইলা গেল। এই মাত্রায় মাছ হবে। মাছ হইয়া গেল। এই মাত্রায় পিপীলিকা হবে। পিপীলিকা হইয়া গেল। এই মাত্রায় মানুষ হবে, মানুষ হইয়া গেল। কোন বিরাম নাই, সমানে চলছে। আপনা আপনি মশা, মাছি, গাছ গাছড়া সব হইয়া চলছে। Seeds চলে যায়। কোন কথা নাই, কারও কিছু বলার নাই। সহজ কথা। তোমার এই জীবনে যে কাজটুকুনু করে তুমি scent নিয়ে বেড়িয়ে গেলা, এই scent-টা দেখা পেল মশার মাত্রায় গিয়া দাঁড়াইছে। পিপীলিকার মাত্রা নিয়া তুমি বাইরাইয়া গেলা। তুমি এখানে কি কর্ম করছো, সেটা তো দেখতে যাবে না। কর্মের সার অংশটা, যা কিছু কাজ করতাছ, তার সারটা কি হইল? কথার কথা কইতাছি, ঐখানে গিয়াই মনে কর, বিরাট Computer Machine-এ ফেলাইয়া দিল। বুঝলা তো? মেশিনে

ঐ মাত্রা অনুযায়ী স্তর হইয়া গেল, লাইনে গিয়া পড়লো। দেখা গেল, এই স্তরে মশা হবে। মশায় চইলা গেল। এই মাত্রায় মাছ হবে। মাছ হইয়া গেল। এই মাত্রায় পিপীলিকা হবে। পিপীলিকা হইয়া গেল। এই মাত্রায় মানুষ হবে, মানুষ হইয়া গেল।

ফেলাইয়া দিয়া দেখলো, সার হইল কেঁচো। কেঁচো থাকে না, মাটির তলে, তুমি কেঁচো হইয়া গেলা গিয়া। কেঁচো থাকে না মাটির তলায়? কেঁচোর মাত্রা মনে কর, ২১/২, ২১/২ (আড়াই) মাত্রায় যার জন্ম, সে সেটা হইয়া যাবে। তারপর মনে কর, ১১২ মাত্রা। দেখা গেল, কচ্ছপ। কচ্ছপে চইলা গেলা গিয়া। একটা মানুষের আকৃতিতে যে Scent টা বেরোবে, যে মাত্রাটা বেরোবে, সেই Scent টা একরকমের। Scent টা সবারই এক। সেটার মধ্যে মাত্রাটা যার যার ভিন্ন। মানুষের আত্মাটা যখন বেরিয়ে যায়, মানুষ আছিল না কুত্তা আছিল, সে বুঝার উপায় নাই। বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে গেল। নম্বরটা নিয়ে বেরিয়ে গেল খাতাটা। মানুষটা তো এখানে। খাতাটা জমা দিয়া দিল্লী গেল গিয়া। ঐটার মধ্যে নম্বরটা লেখা থাকে। তারা আবার একটা নম্বর দিয়া দেয়। ঐ নম্বরে আসে। ঐ নম্বর লেখা থাকবো, ঐ নম্বরে পাইয়া যাইব। মানুষটা তো আর যায় না সেখানে, খাতাটা যায় গিয়া। তোমার জীবনের এতদিনকার সাধনায়, এতদিনকার প্রচেষ্টায় প্রকৃতির মহাদানকে কতটুকুনু Utilize করেছ, যেই দানের সদ্ব্যবহারের জন্য প্রকৃতি তোমাকে এত সুন্দরভাবে সবকিছু দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে, কতটা তুমি তাকে কাজে লাগিয়েছ, কতটা ব্যবহার করেছ? সেইটার মাত্রাটা চলে যায়। আর যদি দেখা যায়, কোন কাম কর নাই, জীবনভর শুধু ঝগড়া বিবাদ, ছলচাতুরী মিথ্যা প্রবঞ্চনা এই চলছে, ছ্যান্ কইরা বাইরাইয়া স্যাট্ কইরা চইলা গেলা। দেখা গেল, সাড়ে ছয় (৬১/২) মাত্রা। ৬১/২ মাত্রা কি? দেখা গেল, এই যত ছোট ছোট মাছ। বেশীরভাগ মাছের ডুলায় (ছোট ঝুড়ি) ছোট ছোট মাছ লইয়া যায় না?

মানুষের আত্মাটা যখন বেরিয়ে যায়, মানুষ আছিল না কুত্তা আছিল, সে বুঝার উপায় নাই। বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে গেল। নম্বরটা নিয়ে বেরিয়ে গেল খাতাটা। মানুষটা তো এখানে।

ছ্যান্ কইরা বাইরাইয়া স্যাট্ কইরা চইলা গেলা। দেখা গেল, সাড়ে ছয় ৬১/২ মাত্রা। ৬১/২ মাত্রা কি? দেখা গেল, এই যত ছোট ছোট মাছ।

আমি ছোটকালে আমার তখন ১৪ বছর বয়স, বাবায় মাছ কিনছে। আমারে কয়, 'ডুলাটা লইয়া যা।' আমি ডুলাটা লইয়া আস্তে আস্তে ঝিমতে ঝিমতে যাইতাছি। দেখি কি, অনেকগুলি মানুষ লইয়া যাইতাছি। কথাটা

বুঝছো? আমি বলি, ডুলাটার মধ্যে এতগুলি মানুষ কোত্থিকা আইল? মানুষের যে Scent-টা নিয়া বাইরাইয়া আসছে, সেই মানুষের Scent-টা রইয়া গেছে। এর আগে যে কি ছিল, সেইটা আর দেখি নাই। আমি করছি কি, তাড়াতাড়ি ডুলাটা ধুইয়া খালি ডুলাটা লইয়া চইলা আইছি। মায় কয় কি, 'মাছ আনলি না?' আমি কই, 'দূর, মাছ কোথায়? আমি দেখি, কতগুলি মানুষ।'

মা কয়, 'কস্ কি?'

এই যে তোমরা মাছ-মাংস খাও, এরমধ্যে খুঁইজা দেখবা, কারও ঠাকুর দাদা, কারও দাদু, কারও পিসি কারও মাসি কারও খুড়ি, কারও জ্যেঠি, এইগুলি সব (বেশীর ভাগ) মাছ, মুরগী, পাঁঠা হইয়া গেছে। আর তোমরা তো খুব স্বাদ কইরা একেবারে পাতরি কইরা, ঝোল কইরা খাইতাছ। এখন বুঝছো? খুব তো ঝোল, পাতরি খাইতাছ। দেখা গেল, অমুকের ঠাকুর দাদা, অমুকের পিসীমা, অমুকের খুড়িমা, এমনকি দেখা গেছে, নিজের বাড়ীর জনও ঢুইকা গেছে এর মধ্যে। কয়েক পুরুষের পূর্বপুরুষ আছিল, বাবার বাবার বাবা, এমনকি বাবাও আইয়া পড়তে পারে। কিছু ঠিক নাই। জানলে মাছের মাথা খাইবা? এরজন্য তখনকার দিনের মানুষরা মাছ, মাংস খাইত না। তাগো দরজাটা খোলা আছিল। তারা বুঝতে পারতো। পঁচিশ, তিরিশ অথবা চল্লিশ হাজার বছর আগেকার মানুষেরা অল্পতেই বুঝতে পারতো। তারা ফলটল খাইতো, স্তন্যপান করে যেরকম তেমনই আর কি। ফলটা আহার করা হইল স্তন্য পান; ফলাহার করে যেরকম, স্তন্যপানও সেরকম। ফলটা যে-ই থাক, যারই থাক, ঠাকুরদাদাই থাক, দিদিমাই থাক, আর খুড়িমাই থাক, স্তনটা তো মায়ের স্তন পান করে। মায়ের মা-ও দেখা যায়, স্তন পান করাইতেছে। আবার একেকবাড়ীতে এমন ছিল, আমার মায়েরা ছিল দশ/বারো জন জা। দশ/বারোটা বাচ্চা শোওয়ানো থাকতো যে যখন যাইত,

এই যে তোমরা মাছ-মাংস খাও, এরমধ্যে খুঁইজা দেখবা, কারও ঠাকুর দাদা, কারও দাদু, কারও পিসি কারও মাসি কারও খুড়ি, কারও জ্যেঠি, এইগুলি সব (বেশীর ভাগ) মুরগী, পাঁঠা হইয়া গেছে।

ফলটা যে-ই থাক, যারই থাক, ঠাকুরদাদাই থাক, দিদিমাই থাক, আর খুড়িমাই থাক, স্তনটা তো মায়ের স্তন পান করে। মায়ের মা-ও দেখা যায়, স্তন পান করাইতেছে।

কতগুলি বাচ্চারে দুধ খাওয়াইয়া চইলা আসতো। এইরকম আছিল। জায়েদের মধ্যে খুব মিল আছিল। একজন আরেকজনরে বইলা দিত মনোরমা, (আমার জ্যেঠিমার নাম) তোমার বাচ্চারে দুধ খাওয়াইয়া আসছি। সে আবার আরেকজনের বাচ্চারে দুধ খাওয়াইয়া আইয়া পড়ছে। এইভাবে মিলমিশ ছিল।

ফলাহার হইল স্তনহিসাবে পান করা। মাছের মাথাটা চিবাইয়া খাওয়া, সেটা হইল আলাদা। মুরগীটা লইয়া আইল, মুরগী দেখা গেল, অমুক দাদু আছিল। দাদুরে রান্না কইরা খাইয়া ফেলাইল। উপায় নাই। গাছেও হয়। গাছে হয় কি, যেটা ভোগ করছে, Like Milk মায়ের স্তনটা যেরকম, সেরকম Applicable হয়ে গেছে। ফলটা স্তনের মত Applicable. এককথায় মায়ের স্তন যেমন পান করছো, খুড়িমার দুধ খাইল, জ্যেঠিমার দুধ খাইয়া ফেলাইল, ফলাহারকে ঠিক সেরকমই মনে করা হয়েছে। কেউ মনে কর, বড়শী দিয়া মাছ ধরলো। মাছ ধইরা খাইয়া ফেলাইল। দেখা গেল, ঐ মাছ তার বাচ্চারে খাওয়াইতে যাচ্ছিল। কতগুলি বাচ্চা মারা গেল। শিকারী শিকার করলো, একটা ওয়াক, কি একটা বক বা বালিহাঁস। খুশীচিত্তে বাটনা বাইটা রান্না কইরা খাইল। এমন সাজা দিল Nature (প্রকৃতি)। একটা বালিকণার হাজার ভাগের ১ ভাগ অপরাধ করলেও ক্ষমা নাই। কাউকে ছাড়বে না। শিকারীরেও ঐরকম সাজা দিয়া দেবে। জ্বালাটাও ঠিক সেইরকম, Heat দিয়া দেয়। এমন যন্ত্রণার যন্ত্রণা, বইলা বুঝানো যায় না। মৃত্যুর পরে সব বুঝতাছে। সব বুঝতাছে, অপদেবতা তো। আর মনে করতাছে, কেন অন্যায়টা করছিলাম, বুঝতাছে সব। কি আকামটা কইরা আইছি। কেন করলাম? জীবনে ভাল কাম করলে এই আফশোসটা থাকতো না। জীবনে আফশোসটাই সবার বেশী। ইস্ ভাল কইরা পড়লে পাশ করতে পারতাম। ইস্ সময়টা নষ্ট করলাম। ইস ভাল কইরা Practice করলে ভাল গান করতে পারতাম। এইভাবে 'আহা' 'ইহি' করতে করতে জীবনটা শেষ। আহা জীবনে কিছুই করতে পারলাম না।

একটা বালিকণার হাজার ভাগের ১ ভাগ অপরাধ করলেও ক্ষমা নাই। কাইকে ছাড়বে না। শিকারীরেও ঐরকম সাজা দিয়া দেবে। জ্বালাটাও ঠিক সেইরকম Heat দিয়া দেয়। এমন যন্ত্রণার যন্ত্রণা, বইলা বুঝানো যায় না। মৃত্যুর পরে সব বুঝতাছে।

ঐখানে গিয়াও দেখতাছি, আহা ইহি করবা। 'জন্মটা তো পাইছিলাম,

বেশীদিন তো না। ক্যান হিংসা করতে গেছিলাম? ক্যান সময়টা নষ্ট করলাম? ক্যান রাগ করতে গেছিলাম? ক্যান মেজাজ করতে গেছিলাম?

জন্ম (আবার জন্ম) না হওয়া পর্যন্ত এই জ্বালা যন্ত্রণা পোহাতে হবে। একটা Period (পিরিয়ড) দিয়ে দেবে। মনে কর, এই আড়াইমাত্রার (২১/২) যে অপকর্মটা করা হইল, তার জেরটা Computer Machine-এ উঠলো, ২০ হাজার বছর। এর Inner (অন্তর্নিহিত) তত্ত্বটা বললাম না। সোজা কথায় বলে গেলাম ২০ হাজার বছর। সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটার মেশিনের মতন মিটার উইঠা যাইব গিয়া। পেট্রল ভরে গাড়ীতে আর মিটার ওঠে পুটুর পুটুর কইরা। বুঝলা না? পেট্রোল ভরে গাড়ীতে আর মিটার উঠতে থাকে তার নিজস্ব ধারায়। তাই কে কি আকাম করতাছ, মিটার উঠতাছে আপনগতিতে। কারও এতে রেহাই নাই। একেবারে তছনছ কইরা ছাইড়া দেবে। Nature এত সহজ না। একেবারে এমনি এমনি ছাইড়া দিব? যাঁর সৃষ্টিতে এত কারিকুরী, এত সূক্ষ্ম বিদ্যা, এত মাধুর্য, ভাবতে গেলে শুধু আশ্চর্যই হতে হয়। একটা Body কিভাবে তার পূর্ণরূপ নিয়ে বেরিয়ে আসছে মাতৃগর্ভ হতে, আজও আবিষ্কার করতে পারে নাই, World এর সব বড় বড় চিকিৎসকরা। কত Research করছে। এত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি যাঁর মাথায় চলছে, তাঁর সৃষ্টি উদ্দেশ্যবিহীন, সে কি কখনো হতে পারে? একেবারে খেলা দেখিয়ে ছেড়ে দেবে Nature. ভালোর ভাল, মন্দের মন্দ। ভাল যদি কর, এমন Good Result পাবে, অফুরন্ত আনন্দের ধারা বইতে থাকবে। আর যদি এই নিয়ে তোমরা ছিনিমিনি খেল, তাইলে একেবারে আমরস বাইর কইরা ছাইড়া দেবে। রক্ত আমাশা কইরা ছাইড়া দেবে। একেবারে খেলা শেষ।

জন্ম (আবার জন্ম) না হওয়া পর্যন্ত এই জ্বালা যন্ত্রণা পোহাতে হবে। একটা Period (পিরিয়ড) দিয়ে দেবে। মনে কর, এই আড়াইমাত্রার (২১/২) যে অপকর্মটা করা হইল, তার জেরটা Computer Machine-এ উঠলো, ২০ হাজার বছর।

মনে কর, তুমি গায়ের জোরে কইতাছ, হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা। খুব একেবারে ফুটানির বাক্স। এই ফুটানির বাক্স এমন ফুটা কইরা ছাইড়া দিব যে, একেবারে খেলা দেখাইয়া দিব। তখনকার বিচক্ষণেরা কি

তুমি গায়ের জোরে কইতাছ, হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা। খুব একেবারে ফুটানির বাক্স। এই ফুটানির বাক্স এমন ফুটা কইরা ছাইড়া দিব যে, একেবারে খেলা দেখাইয়া দিব।

চিন্তা ভাবনায়, ধ্যান-ধারণায় এমনি এমনি জীবন উৎসর্গ করেছে? কত পরিশ্রম একেকজন করেছে। কত কিছু কইরা একেকজন বিশেষজ্ঞ হয়েছে? এমনি এমনি? একেবারে খাস কথাটা তোমাদের বইলা দিলাম। কেমনে হয়, কিভাবে হয়, কোন্ রাস্তা দিয়া হয়, সেটা অনেক গভীর তত্ত্ব। মৃত্যুর পর সবার Metre উঠবেই। তবে এর মধ্যে Punishment হইল Suicide, Heavy Punishment.

মৃত্যুর পর কত লোকের লগে দেখা হইব তোমাগো, দেখবা। যখন যাইতেছে, কত লোকের লগে দেখা হইতেছে। আমি আমার বাবারে কইতাছি, মরণের সময় আমার নাম ধইরা ডাইকা উঠছে। আপনি চলে যাচ্ছেন? মাথা নাড়ে। আমি বলছি, যান গিয়া আপনার বাবার লগে দেখা হইবো। তারপরে যদু রায়ের* লগে দেখা হবে, অশ্বিনীর** লগে দেখা হবে। অনেকের লগেই দেখা সাক্ষাৎ হবে। আপনি ভালই থাকবেন। আপনি যান। বসেন গিয়া। আমরা আসতাছি। পরবর্ত্তী গাড়ীটা যখন ছাড়বে, আমরা যামু। আমরা আসতাছি। আপনি যান।

অনেকের লগেই দেখা সাক্ষাৎ হবে। আপনি ভালই থাকবেন। আপনি যান। বসেন গিয়া। আমরা আসতাছি। পরবর্ত্তী গাড়ীটা যখন ছাড়বে, আমরা যামু। আমরা আসতাছি। আপনি যান।

---

* যদুনাথ রায়— পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের পরমভক্ত যদুনাথ রায় ছিলেন তদানীন্তন সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। S.D.O. যদুনাথ রায় অত্যন্ত সদাশয় ব্যক্তি। ঢাকা নারিন্দার শা সাহেব লেনে তার বিরাট বসত বাড়ী। পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুরের বালক বয়সেই ইনি দীক্ষাগ্রহণ করেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজকে অত্যন্ত সমাদরে ইনি নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু পুরানো ভক্ত এই যদুনাথ রায়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। যদুনাথ রায়ের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে একটি আশীর্বাদী ফুল দিয়ে বলেছিলেন, ''তুমি যাকে ভালবাসো, তাকে এই ফুলটি দিতে পার''। যদুনাথ রায়ের পাশের বাড়ীতেই থাকতেন শ্রী সুনীল ঘোষ ও তার স্ত্রী কমলা ঘোষ। যদুনাথ রায় পরমপূজ্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে এই সুনীল ঘোষের বাড়ীতেও নিয়ে এসেছিলেন। শ্রীমতী কমলা ঘোষ তখন সন্তান সম্ভবা। এই অবস্থাতেই স্বামী স্ত্রী শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। যথা সময়ে তাদের প্রথম সন্তান একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করলো। এই শিশু কন্যাটিকে যদুনাথ রায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাকে নাতনী বলে সম্বোধন করতেন। দেড়/দু'বছর বয়সে এই

'আইচ্ছা', কইয়া বাবায় গেল গিয়া। বইয়া বইয়া কথাবার্ত্তা কইয়া বাবায় চইলা গেল। এরমধ্যে অন্য কিছু নাই। একেবারে পরিষ্কার কইরা ছাইড়া দেবে Nature।

দোগাছিতে একজন আসতো আমার কাছে আত্মা সম্বন্ধে জানতে। নাম কি যেন বলেছিল, একটা বই লিখেছিল। আমি আত্মা সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেছি। 'ও' সেটাতে রং চড়াইছে। অরে অনেক ঘটনা বলেছিলাম। সবাইকে বেশী বলি না। আরেকটা জগতের কথা তো। এমনি কথা প্রসঙ্গে ঘরোয়ানা ক্লাসে বলতে পারি কয়েকটা কথা। এই কথাটা বেশী বলি না। বলার সময় অন্যরকমভাবে বলি। 'নাই' কে হ্যাঁ করাই, যাতে তাড়াতাড়ি বুঝতে সুবিধা হয়। 'নাই' - এর থেকে হ্যাঁ করাই। 'হ্যাঁ-র থেকে 'নাই' করলে অসুবিধা হয়ে যায়। বিরাট ব্যাপার। বিরাট ব্যাপার। এতটুকু

এমনি তুমি যদি - ঠাট্টা কর, বিদ্রুপ কর, তাতে কিছু আসে যায় না। তোমার mind-এ কোনরকম কোন ক্ষতির চিন্তা করতেই পারবে না। তুমি ভাবলে আমারে তুমি ফাঁকি দিয়া গেলা। কম্পিউটার মেশিনে, মিটারের মেশিনে একটুও তুমি রেহাই পাবে না।

কন্যাটি কঠিন বসন্তরোগে আক্রান্ত হলো। কিছুতেই তাকে সুস্থ করা গেল না। ডাক্তাররা জবাব দিয়ে গেছে। বাঁচবার কোন আশাই নেই। কলাপাতায় করে বাইরে শুইয়ে দিয়েছে। বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। যদুনাথ রায় তার আদরের শিশুটির (নাতনীর) এই অবস্থা, অসহায়ের মতো তাকিয়ে দেখছেন। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল শ্রীশ্রীঠাকুরের দেওয়া সেই আশীর্বাদী ফুলটির কথা। তিনি দৌড়ে গিয়ে ফুলটি নিয়ে এসে শিশুটির মাথায় ছুঁইয়ে তার বালিশের তলায় রেখে দিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এরপরই শিশুটি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলো। পরমভক্ত যদুনাথ রায় তার আদরের নাতনীর আরোগ্য লাভে যারপরনাই আনন্দিত হলেন। পরম করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর যেন ভক্ত যদুনাথ রায়কে দেওয়া আশীর্বাদী ফুলটির মাধ্যমে শিশুকন্যাটির পুনর্জীবন লাভের ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিলেন। যদুনাথ রায়ের স্ত্রী, পুত্র, কন্যাগণ সকলেই ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের একান্ত অনুগত ভক্ত।

.** অশ্বিনী চ্যাটার্জী— অশ্বিনী চ্যাটার্জী যখন পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন, তখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ আর শ্রীশ্রীঠাকুরের বয়স ৮ বৎসর। যৌবনকালে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সেবায় তিনি দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেন এবং ভেবেছিলেন লোকনাথ বাবার সেবায়ই নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন লোকনাথ ব্রহ্মচারী তাঁকে সংসারে ফিরে গিয়ে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করতে উপদেশ দেন। তিনি কিছুতেই লোকনাথ বাবাকে ছেড়ে যেতে রাজী হন না। তখন লোকনাথ ব্রহ্মচারী তাকে চিম্‌টা

বাচ্চা বয়স থেকে আমি এই লাইনে এই নিয়ে আছি, বোঝ না। সব আমার নখদর্পণে। আর এই জন্য আমি প্রত্যেকরে জানাইয়া দেই, সাবধান, সাবধান, সাবধান। চারিদিকে কিন্তু Enemy ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটার নাম দিয়েছে Messenger. Enemy ঘুরে বেড়াচ্ছে। একেবারে রসাতলে ডুবিয়ে দেবে তোমাগো। একেবারে ঘরের বার করে ছেড়ে দেবে। এতটুকু মান করবে না, অভিমান করবে না, ছল চাতুরী করবে না। অযথা রাগ করবে না, অযথা হিংসা করবে না, অযথা কিছু করবে না। তারজন্য দেখ, আমার খাওয়া থাকতে খাওয়া নাই, পরা থাকতে পরা নাই, সবকিছু থাকতে কিছু নাই। কোন ব্যাপারে কিছু নাই। সবসময় সতর্ক থাকবে, লোভ সংবরণ করে থাকবে। ওরে বাবা। রক্ষা নাই। এমনি তুমি যদি ঠাট্টা কর, বিদ্রূপ কর, তাতে কিছু আসে যায় না। তোমার mind-এ কোনরকম কোন ক্ষতির চিন্তা করতেই পারবে না। তুমি ভাবলে আমারে তুমি ফাঁকি দিয়া গেলা। কম্পিউটার মেশিনে, মিটারের মেশিনে একটুও তুমি রেহাই পাবে না।

নিয়ে তাড়া করেন। চোখের জল মুছতে মুছতে অশ্বিনী চ্যাটার্জী ফিরে আসেন সংসার জীবনে। বিদায় বেলায় লোকনাথ ব্রহ্মচারী তাঁকে অর্ধমন্ত্র দান করে বলেন, "আজ থেকে অর্দ্ধশতাব্দী পরে এক পূর্ণব্রহ্ম মহান তোমার এই অর্ধচন্দ্র পূর্ণ করে দেবেন।" তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের মায়েরও জন্ম হয়নি। মহাযোগী ত্রৈলঙ্গ স্বামীরও অত্যন্ত স্নেহধন্য ছিলেন এই অশ্বিনী চ্যাটার্জী। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আদেশে বারাণসীতে গিয়ে নিজহাতে পরমান্ন রেঁধে খাইয়েছিলেন তাঁকে।

এরপর অশ্বিনী চ্যাটার্জী গৃহে ফিরে এসে বিবাহাদি করে সংসার ধর্ম পালন করেন। ক্রমে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি সাধনভজনে দিন কাটাতে লাগলেন। সেইসময়ে তাঁর সঙ্গী হিসাবে ছিলেন গুরুট্রেণিং কলেজের অধ্যাপক বিখ্যাত সমাজসেবক চিন্তাহরণ দে। এই চিন্তাহরণ দে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। দিনে দিনে সাধক হিসাবে অশ্বিনী চ্যাটার্জীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। বহু আর্ত মুমূর্ষু মানুষ আসতো তাঁর কাছে রোগ শোকের হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায়। স্বামী বিবেকানন্দও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বামাক্ষ্যাপা, ললিত সাধু প্রভৃতি সাধকদের সঙ্গে তাঁর খুবই অন্তরঙ্গতা ছিল।

অশ্বিনী চ্যাটার্জী সাধনা করে চলেছেন আর প্রতীক্ষা করছেন সেই পূর্ণব্রহ্ম মহানের, যিনি তাঁর অর্ধচন্দ্র পূর্ণ করে দেবেন। তিনি এখন অশীতিপর বৃদ্ধ। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল। সেই শুভক্ষণ সমাগত। এক ঝড়জলের রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ('বালক ব্রহ্মচারী', 'বালক ঠাকুর') কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে নৌকাযোগে যাচ্ছিলেন মুন্সীগঞ্জে। পথে ঝড়ের জন্য নৌকা থামিয়ে নিকটবর্ত্তী এক চরে রাত্রি কাটাতে মনস্থ করলেন। বেশ রাত হয়ে গেছে। কিছু চিঁড়ে

আমার মেসোমশাই সাতটা তীর্থ পাশ। গোল্ড মেডালিস্ট, খুব বড় সাধক ছিলেন। তিনি এসে আমার কাছে বসতেন। আমাকে বলতেন, অবাক কান্ড। কিরকম নখদর্পণে তোমার সব। এই জগৎটাকে তুমি কিভাবে পেয়েছ। কত সৌভাগ্য তোমার।

গুড় কিনে আনার জন্য এক শিষ্যকে নির্দেশ দিলেন। শিষ্যটি নৌকা থেকে নেমে কোথাও এতটুকু আলোর চিহ্ন দেখতে পেল না। কিছু দূরে একটি কুটীরে টিমটিম করে একটু আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। নিরুপায় হয়ে শিষ্যটি সেই কুটীরে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। সেই কুটীরেই রয়েছেন অশ্বিনী চ্যাটার্জী ও চিন্তাহরণ দে। এক 'বালক ঠাকুর' নৌকায় আছেন শুনেই অশ্বিনী চ্যাটার্জী ছুটে এলেন ঘাটে। তাকে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর বলে উঠলেন, ''কে অশ্বিনী না? তোমার অর্ধচন্দ্র পূর্ণ করে নেবে না?'' এই মধুর ডাকটির অপেক্ষাতেই যেন ছিলেন তিনি। অশীতিপর বৃদ্ধ অশ্বিনী চ্যাটার্জী লুটিয়ে পড়লেন 'বালক ঠাকুরে'র পায়ে। সেই রাত্রিতেই বাকী অর্ধমন্ত্র পেয়ে গেলেন তিনি। চিন্তাহরণ দে ও এসেছিলেন সাথে সাথে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকেও কৃপা করে দীক্ষা দিলেন।

এর কয়েক বৎসর পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের খোঁজ করে করে অশ্বিনী চ্যাটার্জী ও চিন্তাহরণ দে এসেছেন ঢাকার স্বামীবাগে। সেদিন রাত্রিবেলা নদীঘাটে দীক্ষামন্ত্র (বাকী অর্ধমন্ত্র) পাবার পর অশ্বিনী চ্যাটার্জীর মনে হয়তো কোন সংশয় জেগেছিল। তাই অনেক খোঁজ করে কয়েক বৎসর পর চিন্তাহরণকে সঙ্গে নিয়ে তারা এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনে। অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর সবই বুঝতে পারেন। তিনি অশ্বিনীর মনের সন্দেহ নিরসনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এরা দুজনেই যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আত্মসমর্পণ করলো, করুণাময় ঠাকুর তখন নিজেই বললেন, ''অশ্বিনী তোর অর্ধমন্ত্রকে আবার পূর্ণ করে দেবো?'' অশ্বিনী বললেন, ''সাগর যখন আছে, কিছু দিলেই তো পূর্ণ হয়ে যায়।''

তার পরম আগ্রহ দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, ''যাও স্নান করে এস।''

দুজনেই স্নান করে এল, ঠাকুর তাদের আবার দীক্ষা দিলেন। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অশ্বিনী চ্যাটার্জী আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে নতুন করে দীক্ষিত করার আগে আবার সেই অর্ধমন্ত্র বলে দিয়ে তারপর পূর্ণমন্ত্র নিজেই দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু হরিষে বিষাদ। এত আনন্দের মধ্যে ও অশ্বিনী চ্যাটার্জীর মনে বড় দুঃখ। তিনি বলেন, ''আমি তো কিছু নিয়ে আসিনি। আমি যে কিছু দিতে পারলাম না।''

শ্রীশ্রীঠাকুর কৌতুকভরে বলছেন, ''তবে তো ভারী অসুবিধার কথা হল। এখন কি করা যায়? আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর আর বল, মনরূপ দক্ষিণা আমি দিয়ে গেলাম। পূজাতে আছে, 'মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, কাঞ্চনাভাবে মনং দদ্যাৎ।' দেবতা যদি তাতেই খুশী হন, আমি তোমার মনরূপ দক্ষিণা পেয়ে খুশী না হওয়ার কি?'' বৃদ্ধ অশ্বিনী চ্যাটার্জী তাই করলেন এবং আনন্দে অশ্রুপাত করতে করতে চলে গেলেন। এরপর অশ্বিনী চ্যাটার্জী বহুবার শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসেছেন। তার প্রিয়সাথী চিন্তাহরণ দে সাথে সাথেই আছে।

আমি বলি, এই সৌভাগ্য আমি কর্মের দ্বারা পেয়েছি। আমার ভিতরে প্রকৃতির যে দান আছে, শুধু আমার বলে নয়, প্রত্যেকের ভিতরেই আছে, যে অমূল্য সম্পদ প্রকৃতি আমাকে gift করে দিয়েছে, সেটাকে আমি অপচয় করতে রাজী নই। এই tendency - টা যদি তোমার থাকে, এই মনোবৃত্তিটা যদি তোমার থাকে যে, প্রকৃতির এই মহাদানকে আমি অপচয় করবো না, আমি সুন্দরভাবে এর সদ্ব্যবহার করবো, তাহলেই হবে। স্টিয়ারিং তো আমার হাতে (প্রত্যেকের নিজ নিজ হাতে)। প্রকৃতি দান কইরা বলছে যে, স্টিয়ারিংটা আমি তোমার হাতে দিয়া দিলাম। তুমি এমনভাবে স্টিয়ারিং চালাইও না, যাতে accident হতে পারে। তুমি accident করতে যেও না। তুমি সাবধান হয়ে যাও। এইটা প্রকৃতি তোমার হাতে দিল। এই স্বাধীনতাটা তোমার হাতে প্রকৃতি দিল। কেন দিয়েছে? তোমার তৈরী হওয়ার জন্য। এই একটা দান। তুমি কি করতে পার? তোমার স্বাধীনতার কোন্ পর্যন্ত সীমা?

(১) আমি ঠাকুরের কাছে আর যাব না।

অশ্বিনী চ্যাটার্জী সজ্ঞানে তার মুন্সীগঞ্জের বাড়ীতে সবাইকে বলে কয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে অনন্তধামে গমন করেন। যেদিন তিনি চলে যাবেন, সকালে উঠেই বৌমাকে জানিয়ে দেন এবং ভাল করে কয়েকপদ রান্না করতে বলেন। তারপর স্নান করে নতুন কাপড় পরেন। খাওয়া দাওয়া শেষ করে বৌমাকে বিছানায় নতুন চাদর পেতে দিতে বলেন। বিছানা করা হলে সেই বিছানায় শুয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে থাকেন। তিনি কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, তাদের খবর দেওয়া হল। তারা এসে পড়লো। এরপর অশ্বিনী চ্যাটার্জী তাদের সাথে প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিলেন। তারপর তিনি যেমন যেমন বলে যাচ্ছেন, ঠিক সেই সেই ভাবে তার পা, কোমর, বুক পর্যন্ত ছেড়ে গেল। সবাই অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। তিনি বলছেন, ''আর বেশীক্ষণ আমার কথা বলার শক্তি থাকবে না। ছেলেরা কেউ যেন আমার মুখে জল না দেয়। আমার মুখে জল দেবে আমার গুরুভাই চিন্তাহরণ।''

তারপর বলে উঠলেন, লোকনাথ বাবা এসেছেন। হঠাৎ একটি গোলাপ ফুল তার বুকে এসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বিনী চ্যাটার্জী বললেন, বালক বাবা এসে গেছেন। আর সময় নেই। 'ঠাকুর, ঠাকুর' বলে মুহূর্ত মধ্যে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তার মুন্সীগঞ্জের বাড়ীতে। সেখানে উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে দেখলো, বালক ঠাকুর (ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ) আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন।

এদিকে ঠাকুর তখন ঢাকাতে। দোতলার ঘরে বসে নানাবিষয় আলাপ আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, ''অশ্বিনী চলে যাচ্ছে। আমায় ডাকছে। আমায় ডাকছে। আমি একটু ঘুরে আসি।''

(২) আমি ওর সাথে বন্ধুত্ব ছেদ করলাম।

এই স্বাধীনতাটা প্রকৃতি দিয়ে দিয়েছে। তুমি কতটা স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার কর, সেটাই সে (প্রকৃতি) দেখবে।

আমি এটা করবো না। আমি এটা ইচ্ছামতন করবো। আমি মদ খাব। আমি যা খুশী তাই করবো। আমি সোনাগাছি যাব। আমি যা খুশী তাই অবিচার করবো। আমি ঐ মেয়ের সাথে যাব। আমি বদামি করবো। আমি খুন করবো। আমি যা খুশী তাই অত্যাচার করবো। এই স্বাধীনতাটা তোমাকে দিল।

আবার আমি অন্যায় কিছু করবো না। আমি জপ করবো, আমি ধ্যান করবো। আমি মিথ্যা কথা বলবো না। আমি ছলচাতুরী করবো না। opposite কথাটা বলতে পারবে। এটাও স্বাধীনতা। সুতরাং nature দেখবে, আমি (প্রকৃতি) যে স্বাধীনতাটা দিলাম, তার কতটা utilize করে, সদব্যবহার করে। দেখা গেল, 'ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় যেমন, সেরকম অবস্থা। এখন ভাল খুঁজতে গেলে ভাল আর খুঁইজা পাওয়া যায় না।

আরে, জীবনে একটা লোক বহু অপরাধ করেছে, বুঝলা? আমার কাছে আসতো। সবরকম অপরাধ করেছে। এমন অপরাধ নাই যে, সে না করেছে। একটা দিন নাই, যেদিন সে অপরাধ করে নাই। ওর তখন ৭৫ বছর বয়স। আমি সেইসময় ঢাকা স্বামীবাগে থাকি। আমার কাছে আইসা কান্নাকাটি করছে। জীবনে কোন ভাল কাম করে নাই। আমি ইচ্ছা কইরা একটা খেলা দেখাইলাম। ইচ্ছা কইরা অর মাথায় হাত দিলাম। মাথায় হাত দিয়া দেখলাম, অর কিছুই নাই। জীবনে অর কোন ভাল কাম নাই। জীবনে অর ভাল কোন কিছুই নাই। সব অপরাধে ভরা।

আমি ইচ্ছা কইরা একটা খেলা দেখাইলাম। ইচ্ছা কইরা অর মাথায় হাত দিলাম। মাথায় হাত দিয়া দেখলাম, অর কিছুই নাই। জীবনে অর ভাল কোন কাম নাই। জীবনে অর ভাল কোন কিছুই নাই। সব অপরাধে ভরা।

হঠাৎ দেখি, একটা আলো আছে। আমি বলি, একটা আলো তোর মধ্যে আছে। তাতে কিন্তু তোর ভাল হইতে পারে।

'ও' বলে, আলো আছে একটুখানি? আমি বলি, হ্যাঁ, একটু আছে। First - এ দেখলাম, কোন ভাল কাম (কাজ) করে নাই। তারপরে দেখলাম, একেবারে ২৫ বছর পরিষ্কার হইয়া গেছে। এটা হইল কি কইরা?

অরে জিগাইলাম, এমন কি সৎকাম করছোস?

— বাবা, কোন সৎকাম করি নাই।

একেবারে minimum ২৫ বছর সব পাপ, সব দোষগুলি কাইটা গেছে গিয়া। খুঁজতে খুঁজতে আমি দেখলাম, এমন কোন বিড়াল বা গরু, বা এমন কোন কাউকে তুই রক্ষা করছোস?

— বাবা, একটা কাম করছি।

একটা বাছুর চোরাবালিতে আইট্কা গেছে গিয়া। আমি তখন যাচ্ছিলাম। দেখি, বাছুরটা ভ্যা ভ্যা ভ্যা ভ্যা করতাছে। উঠতে পারছে না। সন্ধ্যা হইয়া গেছে। দেখি, অরে (বাছুরটারে) শিয়ালে খাইব। আমি তখন বাছুরটারে অনেক যত্ন কইরা তুইলা পরিষ্কার টরিষ্কার কইরা ছাইড়া দিছি। বাছুরটা একেবারে দৌড়।

একটা মাত্র কাম (কাজ) করছোস। কত সহজ। দেবতার রাজ্যে প্রকৃতির রাজ্যে একটা কাম করছোস্। তাতেই ২৫ বছরের দোষগুলি কাইটা গেল গিয়া।

একটা মাত্র কাম (কাজ) করছোস। কত সহজ। দেবতার রাজ্যে প্রকৃতির রাজ্যে একটা কাম করছোস্। তাতেই ২৫ বছরের দোষগুলি কাইটা গেল গিয়া।

— বাবা, আর কত আছে?

— তোর আর কত বাকী আছে? বেশীদিন নাই। আর ১০/১৫ বছর। এই ১০/১৫ বছরের দোষগুলি যদি কাটাইয়া ফেলাইতে পারোস, তাইলে একেবারেই পরিষ্কার হইয়া গেলি গিয়া। তাইলে বুইঝা দেখ, এই ২৫ বছরে কত অপরাধ করেছিস্ তুই।

— বলে, অনেক অপরাধ করেছি বাবা।

এত সহজে অপরাধ কাটিয়ে ওঠা যায়? তাহলে আজ থেকে যদি আমি আর কোন অপরাধ না করি?

আমি বলি, তোর সেই অপরাধ তো কাটবেই। উপরন্তু তোর আরও সঞ্চয় হয়ে যাবে। সে এই যে বসলো জপ করতে, আর কারও দিকে তাকায় না, কারও সাথে কথা বলে না। শুধু বলে, আমার জীবনের শেষ সীমানায় শেষ চেষ্টা করে দেখি।

তারপরে আবার ছয়বছর পরে আমার কাছে আসছে। আমি বলি, যা, তোর সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। দেখতো, এতদিনের অপরাধ ছয়বছরে কাটলো, আর একদিনের incident এ পঁচিশ বছরের অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে গেল। তোমাদের অপরাধের সঞ্চয়গুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এতদিন যে অপরাধগুলো করেছ, এমন কোন সুন্দর কাজ যদি করতে পার, তবেই হবে, বাঁচার পথ।

মনের মধ্যে হিংসা, রাগ, মেজাজ কিচ্ছু রাখবে না। ভোগের মাত্রা বাড়াবে না। কোন বিষয়ে হিংসা- দ্বেষ রাখবে না। সম্পূর্ণভাবে নিজেকে স্বচ্ছ আর পবিত্রতায় রাখবে। দোষ হবে না কোনটায়? যেমন কাম (কামনা) এদিক ওদিক যায়। এদিক ওদিক মন যাবে, তাতে দোষ হয় না। এগুলো আসে যায়। এটা হবে। তারমধ্যে খেয়াল রাখতে হবে, বুঝে বুঝে চলতে হবে। মনে কর, একটা মেয়ের একটা ছেলেকে দেখে ভাল লাগলো। উঁচা লম্বা, দেখতে সুন্দর ছেলেটা। মেয়েটা মনে মনে ভাবছে, একে যদি আমি স্বামী পেতাম, আহা। ঐটুকু হল। তার সঙ্গে অনুশোচনাটা বাড়িয়ে দিল। এখানেই সংযত হবে। লোভের জিহ্বাটা বাড়াবে না। ভাববে, এরকম চিন্তা করাটা উচিত হয়নি আমার।

মনের মধ্যে হিংসা, রাগ, মেজাজ কিচ্ছু রাখবে না। ভোগের মাত্রা বাড়াবে না। কোন বিষয়ে হিংসা-দ্বেষ রাখবে না। সম্পূর্ণভাবে নিজেকে স্বচ্ছ আর পবিত্রতায় রাখবে।

দুটো ছেলে, দুই বন্ধু। একজন গেল সোনাগাছি, আরেকজনরেও টানছিল - চল যাই। সে বললো না, যাব না। সে গেল কীর্তনে। সেই

ছেলেটা কীর্তনে বসে হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ করছে।

আর যে ছেলেটা সোনাগাছি গেছে সে ভাবছে, 'বন্ধু' কীর্তনে গিয়ে ভগবানের নাম করছে আর আমি এখানে মদের বোতল নিয়া নাচানাচি করছি। 'ও' কত নাম করছে, গান করছে; আমি পাপীতাপী হয়েই রইলাম। আমার ভাল লাগছে না।

আর কীর্তনে বইসা সেই ছেলেটা ভাবতাছে, বন্ধু কেমন সোনাগাছি গিয়া স্ফূর্তি করছে, নাচানাচি করছে, আর আমি এখানে বইয়া পড়ছি। দুইটা ছেলেই আমার কাছে আইয়া উপস্থিত। সোনাগাছিতে যে গেছিল, সে করলো পূণ্যকাজ। সে পাপমুক্ত হইয়া গেল। কারণ অর (ওর) মনটা ঐখানেই (কীর্তনেই) পইরা আছিল। 'ও' মনে করতাছে, বন্ধু নাম করতাছে, গান করতাছে, সুন্দর রাধাকৃষ্ণের মূর্তি দেখতাছে। আর আমি এখানে নর্দমার মধ্যে পইরা রইছি। হায় ঠাকুর, আমি শুধু অপরাধ করতাছি। আমি মায়ের কথা শুনি না, বাপের কথা শুনি না। কারও কথা শুনি না। অর্থোপার্জন কইরা সব ঢালতাছি। হে ঠাকুর আমারে ক্ষমা কইরো। আমার বন্ধু বলছিল, চল কীর্তনে, আমি কীর্তনে গেলাম না। আমারে ক্ষমা কইরো ঠাকুর। এইভাবে অনুশোচনা কইরা কইরা সে পাপমুক্ত হইয়া গেল। আর যে কীর্তনে গেছিল, সে ডুবলো। কারণ সে কীর্তনের আসরে বইসা থাকলেও তার মনটা সোনাগাছিতেই পইরা আছিল। আর সারাক্ষণই চিন্তা করছিল যে, বন্ধু, কেমন নাচতাছে। স্ফূর্তি করতাছে, মদ খাইতাছে।

সুতরাং দেখ, মনের ব্যাপার। দেহের ব্যাপার কিছু নাই। কত সুন্দরভাবে কাজ। মনের ব্যাপারটাই বেশী। ঘটনার ব্যাপারে বেশী থাকে না। প্রয়োজন হয় না। তুমি যদি মনে মনে এরকম কিছু কর, ডুববে।

কিরকম? মা যেমন একটা শিশুর, তাঁর সন্তানের লালনে পালনে সর্বদা নজর রাখে, শিশুকে যদি কেউ জলে ফেলে দেয়; সে তো সাঁতার জানে না, মা সাঁতার না জানলেও নিজের জীবন বিপন্ন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে

তার সন্তানকে বাঁচাবার জন্য, ঠিক সেরকম শুদ্ধ পবিত্র মন নিয়ে তোমার আশেপাশে সবার জন্য যদি তুমি করতে পার, মা যেমন লালনে পালনে আপদে বিপদে শিশুকে রক্ষা করেন, এরকম নিজের সন্তানকে রক্ষা করার মত মনোবৃত্তি যদি সর্বত্র সর্বাবস্থায় সবদেশের সন্তানদের প্রতি রাখতে পার, তাহলেই হবে।

প্রকৃতি (nature) সীমারেখা তো দিয়েই দিয়েছে। দৃষ্টান্তটা এইজন্যই দাঁড় করিয়েছে। নাহলে দিত না। সবার পক্ষেই তা সম্ভব। সীমারেখাটা তাই দাঁড় করিয়েছে। গোলকধাঁধায় দিয়ে দিয়েছে এই সীমারেখা। সেই সীমারেখায় পৌঁছবার জন্যই এই দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়েছে। নাহলে এতবড় দৃষ্টান্ত পেটের মধ্যে বাচ্চা দেওয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না। সব ধুপ ধুপ কইরা পড়ত। সুতরাং natural gift হিসাবে nature আমাদের অনেক কিছু দিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির সেই মহাদানের মর্যাদা রক্ষা করে তার সদ্ব্যবহার করাই আমাদের সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শুদ্ধ পবিত্র মন নিয়ে তোমার আশেপাশে সবার জন্য যদি তুমি করতে পার, মা যেমন লালনে পালনে আপদে বিপদে শিশুকে রক্ষা করেন, এরকম নিজের সন্তানকে রক্ষা করার মত মনোবৃত্তি যদি সর্বত্র সর্বাবস্থায় সবদেশের সন্তানদের প্রতি রাখতে পার, তাহলেই হবে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

বিদেহীরা আজ দেহের মাঝে আশ্রয় নিয়ে সব নৃত্য করছে

লেকটাউন - কোলকাতা
২৫-১০-১৯৮৫

সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারায় সৃষ্টি হতে হতে আবর্তনে বিবর্তনের ধারায় ধারায় ক্রমে মনুষ্যরূপের সৃষ্টি হল। মানুষকে সৃষ্টি কইরা তার দেহযন্ত্রে আঘাত দিল, রোগ দিল, শোক দিল, ব্যথা দিল, বেদনা দিল। তারপর শেষবেলা কিছু বৎসর ভোগ করাইয়া খোঁচাখুঁচি কইরা জিহ্বা বাইর কইরা দিল। হাঁ কইরা পইরা রইল। ব্যাস্। খালাস। একেবারে পৃথিবীর বাইর কইরা দিল।

প্রত্যেকটি দেহের মধ্যে বিদেহীরা বাস করছে। তার সাথে সাথে মানুষে মানুষে যা সম্পর্ক, আশা-আকাঙ্খায় কামনা-বাসনায় দেনা-পাওনায়, হাটে-বাজারে, চিঠি-পত্রে, প্রেম-ভালবাসায়, গল্পে ছন্দে, 'কেমন আছেন, কেমন আছেন, কোথায় আছেন?' হ্যানে ত্যানে, কথাবার্তায়, রোগে শোকে দুঃখে ব্যথায় ছ্যাঁচা দিয়া, জিহ্বা বাইর কইরা দিয়া শেষবেলা, হরিবল ভাই। দেহ ছেড়ে বেড়িয়ে গেল। ঐখানে গিয়া আবার ঘুরতাছে, 'কোথায় যান মশাই?' একজন জিজ্ঞাসা করে। ঐ দেশে গিয়া ঘুরতাছে। আরেকটা দেহ যেন পায়। আরেকবার দেহ ভাড়া করার জন্য ঘুরতাছে।

ঐখানে গিয়া আবার ঘুরতাছে, 'কোথায় যান মশাই?' একজন জিজ্ঞাসা করে। ঐ দেশে গিয়া ঘুরতাছে। আরেকটা দেহ যেন পায়। আরেকবার দেহ ভাড়া করার জন্য ঘুরতাছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিদেহীরা সব দেহ নিয়া এখানে বসে আছে। তাহলে সম্পর্কটা কি? দেহের মাঝে বিদেহীর সম্পর্কটা কি?

সমুদ্রের মাঝে একটা দ্বীপ। একটা জাহাজে করে ২০ হাজার লোক ঐ দ্বীপে যাচ্ছে থাকার জন্য। তাদের জীবনের মেয়াদ এক মাস। একমাসের জন্য প্রচুর ধনরত্ন, ঐশ্বর্যের ভান্ডার, আহার-বিহার, বিলাস-ব্যসনের সবকিছু ব্যবস্থা নিয়ে তারা গেল ঐ দ্বীপে। চারিদিকে জল, সমুদ্র। মাঝখানে ঐ দ্বীপ। টাকায় পয়সায় সোনায় দানায় এত গুছিয়ে দিয়েছে যে, অন্ত নাই। জীবনের মেয়াদ এক মাস তো, কারও মনেই আনন্দ নাই। কত সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে, কত সুন্দর সুন্দর ছেলে। একজন বলে আরেকজনকে, 'এস আমরা প্রেম করি। তোমাকে দেখে আমার ভাল লেগেছে। আমি তোমাকে ভালবাসি'। কিন্তু যাকে ভালবাসতে যাচ্ছে তার তো ভাল লাগে না। সে বলে, আর কতদিন আছে? দিন মনে হলে আর ভাল লাগে না। ২০ দিন হইয়া গেছে গিয়া। প্রেম করতে ইচ্ছা নাই। ভালবাসা ভাল লাগে না। এত টাকা পইরা রইছে, ভাল লাগে না। ঐসব সোনার গয়না, হীরার আংটি, পইরা লাভ কি? এত খাওয়া, আর কত খাইব? ভাল লাগে না। দেখা যাইতেছে, টাকা পয়সা, সোনা দানা সব একজায়গায় স্তূপ কইরা থুইয়া দিছে। ভাল লাগতেছে না। এক মাসের মেয়াদ তো। ২৭ দিন হইয়া গেছে। আর তিন দিন বাকী। প্রচুর দিয়া দিছে; যে যত পার ভোগ কর। ২৮ দিন হইয়া গেল। আর মাত্র দুই দিন বাকী। যত প্রেম ভালবাসা এর ওর দিকে তাকানো; আর তাকিয়ে কি হবে? কিছুই ভাল লাগতেছে না। আজ২৯ দিন। আর একদিন বাকী। সোনা গয়না, দামী কাপড়-চোপড় সব ফেলাইয়া দাও। কিছুরই দরকার নাই। আর কারও দিকে তাকাইয়া লাভ নাই। আর কোন লাভ নাই, কোন লাভ নাই। আজ ২৯ দিন। চল যাই সমুদ্রের পাড়ে যাই। হে ভগবান, হে ভগবান সমুদ্রের জল তো উপর দিকে উঠতাছে। সব তো ডুইবা মরতে হইব। জল তো উঠতাছে। হায় হায়রে। যত সুন্দরী সুন্দরদের প্রেম ভালবাসা

যত সুন্দরী সুন্দরদের প্রেম ভালবাসা সব তলাইয়া গেল। যত সোনা গয়না, টাকাপয়সা, মূল্যবান অলঙ্কার, কাপড়-চোপড় সব সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া লইয়া গেল, সব পরিষ্কার হইয়া গেল।

সব তলাইয়া গেল। যত সোনা গয়না, টাকাপয়সা, মূল্যবান অলঙ্কার, কাপড়-চোপড় সব সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া লইয়া গেল, সব পরিষ্কার হইয়া গেল।

তোমরা এই যে পৃথিবীতে বসবাস করতাছ, সেটা ঐ দ্বীপে বাস করার মতো। ১ মাসের জায়গায় ৬০/৭০/৮০ বৎসর, ৮০ বৎসরের মেয়াদ; ঘটনা একই। তোমরা মনে করতাছ, খুব ধুম (ক্ষমতা) পাইয়া গেছি, খুব মজা পাইয়া গেছি। খুব প্রেম করতাছি, খুব খেলা করতাছি, খুব খাওয়া খাইতাছি, খুব চুরিধারি করতাছি, ডাকাতি করতাছি। যা খুশী তাই করতাছি। যেমন খুশী চলতাছি। যেমনে সেমনে চলতাছি। এক্কেবারে কোমর ভাইঙ্গা (ভেঙে) দিব তোমাদের। চিন্তা নাই। খুব ইচ্ছামতন চলতাছ। দেবতার রাজত্বে, দৈবের রাজত্বে যা খুশী তাই করবা, ইচ্ছামতন অনাচার, অবিচার কইরা চলবা, কোন সাজা (শাস্তি) পাইবা না? খাওয়া-দাওয়ায়, চলাফেরায়, প্রেমভালবাসায় nature সব ছাইড়া (ছেড়ে) দিয়া গেছে তোমাদের। আজ একজনের মুখের গ্রাস আরেকজনে নেয়। গরীব মানুষের খাওয়া আরেকজনে খেয়ে নেয়। তোমরা যা খুশী তাই করতাছ। বাপেরে ফাঁকি দাও। মায়েরে ফাঁকি দাও। যা খুশী তাই অবিচার, অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছ। কতদিন চালাবে?

দেবতার রাজত্বে, দৈবের রাজত্বে যা খুশী তাই করবা, ইচ্ছামতন অনাচার, অবিচার কইরা চলবা, কোন সাজা (শাস্তি) পাইবা না?

বাস্তব জীবনে এই ৩০ বছর, ৩৫ বছর, ৪০ বছর চলে গেল। হায় হায়রে! আর তো বেশীদিন নাই। ৫০ বছর, ৬০ বছর, ৬২ বছর হইয়া গেল। হায় হায় রে! দিন তো শেষ হইয়া যাইতেছে। দিন তো থাকবো না। আয়ু তো শেষ হইয়া যাইতেছে। বয়স তো বাইড়া (বেড়ে) যাইতেছে। এ চইলা (চলে) যাইতেছে। সে চইলা যাইতেছে। কেউ তো থাকবো না। চারিদিক থিকা অশান্তিতে ঘিরা (ঘিরে) ধরতাছে (ধরছে)। চারিদিকে আগুন জ্বলতাছে। শ্মশান মনে হইতাছে। সব চইলা যাইতাছে। চারিদিকে অশান্তির

মা বলছেন, 'ঠাকুররে কইস্, আমারে যেন শেষগতি কইরা দেন। আর তো পারি না। মুখে গঙ্গাজল দিস্। যা পারিস্ করিস্।' এই কথা কইয়া হাঁ কইরা রইছে। ব্যাস্, হইয়া গেল। পৃথিবীর সব খেলা শেষ।

আগুণ জ্বলতাছে। আর তো পারি না। আমার আর কিছু নাই। মা বলছেন, 'ঠাকুররে কইস্, আমারে যেন শেষগতি কইরা দেন। আর তো পারি না। মুখে গঙ্গাজল দিস্। যা পারিস্ করিস্।' এই কথা কইয়া হাঁ কইরা রইছে। ব্যাস্, হইয়া গেল। পৃথিবীর সব খেলা শেষ।

এদিকে সব ইচ্ছামতন চলছে। একটাও পার পাইবা না। প্রকৃতির রাজত্বে পার (রেহাই) পাবার কোন উপায় নাই। কি আছে, কি নাই আমি বলছি না। একেবারে Mathematics, অঙ্ক। একেবারে গণিতের উপরে দেশ, রাজত্ব চলছে। গণিতকে ফাঁকি দেওয়া চলবে না। জেনে রাখ, তোমরা কেউ ফাঁকি দিয়ে, শয়তানি করে, চালাকি করে, অন্যায় করে চলতে পারবে না। কেউ রেহাই পাবে না। যদিও সৃষ্টির রহস্যে বিশ্ব নিয়ন্তার চোখ, মুখ দেখতে পাচ্ছ না, দেবদেবতার সঠিক সন্ধান পাচ্ছ না, কে দেখছে কে শুনছে তার সন্ধান পাচ্ছ না। কি আছে, কি নেই জানতে পারছো না। কিন্তু জানতে পারছো তাঁর সৃষ্টি রহস্যে সৃষ্টিতত্ত্বের কার্যকলাপ। এই অনন্ত সৃষ্টিকার্যের ধারাপাতার ধারা ধরে ধরে এগিয়ে গেলেই বিচার করতে পারবে, তাঁর (প্রকৃতির) সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাব নাই, সূক্ষ্মবুদ্ধির অভাব নাই, সূক্ষ্মচিন্তার অভাব নাই, সূক্ষ্মবিচারের কোনদিক থেকে কোন ত্রুটি নাই। বুঝতে পেরেছ? তিনি (প্রকৃতি) সব কলকাঠি দিয়ে, তাঁর সৃষ্টির মাধুর্য দিয়ে সৃষ্টির ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আওতায় থেকে তার মধ্যে ফাঁকিঝুঁকি অপরাধ, অন্যায় অবিচার নিজে করে যাবে, আর নিজের বুদ্ধিমতন মনগড়া কাজ চালিয়ে যাবে, প্রকৃতি তোমাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেবে?

তিনি (প্রকৃতি) সব কলকাঠি দিয়ে, তাঁর সৃষ্টির মাধুর্য দিয়ে সৃষ্টির ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আওতায় থেকে তার মধ্যে ফাঁকিঝুঁকি অপরাধ, অন্যায় অবিচার নিজে করে যাবে, আর নিজের বুদ্ধিমতন মনগড়া কাজ চালিয়ে যাবে, প্রকৃতি তোমাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেবে?

তুমি ভাবছো, নিজের ইচ্ছামতন কাজ করবো; অন্যের কি হল না হল, জানি না। ভোগ করতাছি, ইচ্ছামতন ভোগ করবো। নিজের ইচ্ছামতন যা খুশী তাই করে যাব। এই জীবনেই শেষ। যা খুশী করবো।'

যা খুশী তাই করে যাচ্ছ, করছো, কর। বলার কিছু নাই। কেউ বলছেও না। কিন্তু এটাও ঠিক কথা, প্রকৃতির রাজত্বে ফাঁকি দিয়ে কেউ চলতে পারবে না। প্রকৃতির গণিত এত শক্ত, এত নিখুঁত, এত যোগ, এত বিয়োগ, এত পূরণ, এত ভাগ যে, এর প্রতি কণায় কণায় রহিয়াছে তাঁর লক্ষ্য। কে লক্ষ্য করে খুঁজে পাই না, কে কথা বলে খুঁজে পাই না, কে দেখে খুঁজে পাই না। কিন্তু খুঁজে পাই এইটুকুনু, খুঁজে পাই তাঁর সৃষ্টির ধারাবাহিকতা, ধারাপাতা। তাঁর সৃষ্টির কার্যকলাপ, তাঁর সৃষ্টির মাধুর্য, তাঁর সৃষ্টির নিপুণতা দেখে এইটুকুনু বিচার করবে তোমরা যে, তার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে রহিয়াছে অতি সূক্ষ্ম বিচার। এই সূক্ষ্মবিচারের হাত থেকে কেউ রক্ষা পেতে পারে, এটা হতে পারে না। কে করবে, তা আমি বলছি না। দেবতা আছেন, না আছেন, তাও আমি বলছি না। আমি বলতে চাই, এই সূক্ষ্ম বিচারাধীনে আবহমানকাল থেকে আজ পর্যন্ত সৃষ্টিতে যে সৃষ্টিরহস্য চলছে, আজকের এই জগতে এত যে সৃষ্টির ধারাবাহিকতা চলছে, আজকের এই সৌরজগতে এত যে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রের বসবাস চলছে, কার ইঙ্গিতে তা জানি না। তা বলার এখন প্রয়োজন বোধ করছি না। বলবো আমি সেইকথা একদিন। কিন্তু আজ আমি বলছি না। শুধু এটুকু বলছি, এই অনন্ত সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারা হঠাৎ হয়নি। হঠাৎ হয় না। হঠাৎ এভাবে সবদিক নিখুঁতভাবে সাজানো হতে পারে না। এত সুন্দর, এত সুসজ্জিত সৃষ্টি; সবদিক বিবেচনা করেই আজকের এই পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব।

এই অনন্ত সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারা হঠাৎ হয়নি। হঠাৎ হয় না, হঠাৎ এভাবে সবদিক নিখুঁতভাবে সাজানো হতে পারে না। এত সুন্দর, এত সুসজ্জিত সৃষ্টি; সবদিক বিবেচনা করেই আজকের এই পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব।

তোমরা কিন্তু ভুল করো না পথিক, যাত্রিক। ফাঁকি দেবে আমাকে, ফাঁকি দেবে ওকে, ফাঁকি দেবে অন্যকে। কিন্তু ফাঁকি দিতে পারবে না নিজেকে। তার কারণ **সৃষ্টিতত্ত্বে বিবেককে দিয়েছে এক তীর মার্কা হিসাবে** (তীর চিহ্নের মত)। নির্জন রাস্তায় অথবা একাধিক রাস্তার সংযোগস্থলে দিগভ্রান্ত

প্রকৃতি আপনমনে আপনি প্রাণপণ চেষ্টায় প্রচেষ্টায় সদাসর্বদা সচেষ্ট। তাঁর (প্রকৃতির) অন্তরঢালা প্রেম ভালবাসায়, স্নেহে মমতায় সবাইকে মিশিয়ে দেবার প্রচেষ্টাতেই সে রত। এটাই তাঁর একমাত্র কামনা।

পথিককে সঠিক পথ নির্দেশ করার জন্য যেমন তীর চিহ্ন (arrow-mark) দিয়ে দেয়, আমাদের নিজেদের মধ্যেও সেই তীর দিয়ে দিয়েছে, সেটি হল বিবেক। ঐ বিবেক তোমাদের সচেতন করে দিচ্ছে, সজাগ করে দিচ্ছে। তোমাদের শয়তানি, তোমাদের কলকৌশল, তোমাদের কার্যকলাপ, তোমরা কে কি কর না কর, প্রতিমুহূর্ত্তে তার সাবধানতার দিকটায় রয়েছে বিবেক। বিবেক সবসময় সজাগ করে দিচ্ছে, 'হও সাবধান'। ন্যায়নিষ্ঠার পথে, সততার পথে চালনা করার জন্য, নিজেকে চালিত করার জন্য বিবেক সদাই সচেষ্ট। ভুলে যেও না, প্রকৃতি তোমাদের গাড্ডায় ফেলতে চায় না। প্রকৃতি আপনমনে আপনি প্রাণপণ চেষ্টায় প্রচেষ্টায় সদাসর্বদা সচেষ্ট। তাঁর (প্রকৃতির) অন্তরঢালা প্রেম ভালবাসায়, স্নেহে মমতায় সবাইকে মিশিয়ে দেবার প্রচেষ্টাতেই সে রত। এটাই তাঁর একমাত্র কামনা। সৃষ্টির সারা ইঙ্গিতে এটাই বুঝা যায়, বুঝতে পারা যায়। বুঝতে গেলে বুঝতে পারবে। বুঝতে চেষ্টা কর। ভুলে গেলে চলবে না, বুঝলে বাবা? এমনি করে আস। একটা মানুষের ভিতরে কতগুলি মানুষ দেখতে পাচ্ছ। এমনি এমনি খেলার ছলে ঐগুলি ফেলে (বীর্যপাত) দেবে। আর যা খুশী তাই-করবে, তাহলে কি করে হবে?

প্রঃ— কি হবে বাবা?
একটু যদি বলো,
উঃ— এই সম্বন্ধে গত সপ্তাহে বলেছি।
প্রঃ— আবার একটু বল বাবা—

একটা মানুষের ভিতরে না হলেও সারা জীবনে যা বীর্যপাত হয়, এরকম বড় বড় দুই বালতি (২০ লিটারের বালতি)। মনে কর, ২০ হাজার কোটি মানুষ হইল minimum তোমাদের মধ্যে বিরাজমান। ১০০ হাজারে এক লাখ। ১০০ লাখে ১ কোটি। এই রকম ২০ হাজার কোটি মানুষ একেকটি মানুষের মধ্যে বিরাজমান। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে sense আছে। সেইজন্য দুইটা দিয়েছে ছেলে এবং মেয়ে। মেয়ের মধ্যে তো বীর্য নাই। না হইলেও তার মধ্যে যে বীর্যটা আছে, দুইটা একত্র না হইলে কিন্তু মানুষের রূপ ধরবে না। Male and female-এর both combination-এ copulation-এ যে scent-টা grow করবে, তাতে Male and female এর both sex-এর sparmatoza যেটাকে

বলে, সেটা creation হবে। Male and female both বলছে হবে। Sexually হবে; চিন্তা কইরাই sex হয়। তাহলে তোমার মধ্যে ২০ হাজার কোটি মানুষ, অর (ওর) মধ্যে ২০ হাজার কোটি মানুষ, তার মধ্যে ২০ হাজার কোটি মানুষ আছে। তোমাদের মধ্যে যেই sex-এর ভাবটা আছে, সেইটার combination-এ, sex-এর combination-এ ঐটার মধ্যে যে copulation হয়, তাতে sparmatoza, তাতে বীর্যকীট তৈরী হয়। তোমার মতো যে ছেলে মেয়ে সব both সবার মধ্যেই ২০ হাজার কোটি মানুষ। তার মধ্যে না হোক ১ হাজার কোটি বাদ দিলাম, বাদ দিলাম ১ হাজার কোটি। ১৯ হাজার কোটি থাকবে।

১৯ হাজার কোটি মানুষ যদি তোমার মধ্যে growth হয়, সব power গুলি growth হবে। দৃষ্টি growth হবে, mind growth হবে, thought growth হবে, ear growth হবে, সব যন্ত্র গুলির growth হয়ে যাবে। ভিতরের যন্ত্রগুলির tune-টা, ঐ tune-টা হবে nature-এর microscopic tune. ঘড়ির কাঁটার যে যন্ত্র, তার যে টিক টিক শব্দ, সবাই শুনতে পারে না। যার কান খুব ভালো, সে শুনতে পারে। খালি চোখে যা দেখা যায় না, microscopic যন্ত্র দিয়ে তা দেখা যায়। ঐটা হইল তোমার ভিতরে nature-এর মহাদান।

তোমার ভিতরে ১৯ হাজার কোটি X ২ = ৩৮ হাজার কোটি চোখের যে দৃষ্টিশক্তিটা, সেই microscopic দৃষ্টি দিয়ে কোন star যখন দেখবা, ঐখানে যদি কেউ ভাত খায়, দেখবে ভাত খাইতেছে, ঐখানকার কথাবার্তা আবার ঠিক সেইরকম শুনতাছো। তোমার মধ্যে সেটা automatically হবে। copulation হইয়া automatically গাছ হয়ে যাবে। তাই ১৯ হাজার কোটি মানুষকে সংঘবদ্ধ করে তোমার ভিতরে, তোমার সঙ্গে Sense-এর organization-টা যদি ঠিকমত guide করতে পার, sense-organization-এর মাধ্যমে সবাই যদি united হয়ে থাকে, sense-টাকে একাই যদি concentrate করতে পার, তবে তার থেকে যে result -টা তুমি পাবে, সেটা unique result. তোমার sense and common sense যেটা দিয়েছে, এইটা হইল protected, তোমার protection এর অস্ত্র। common ভাবে

যে sense-টা natural gift আছে, বলছে (nature) এটাই যথেষ্ট তোমাকে protection দেবার। কিন্তু তোমরা যখন ত্রুটি করছো, সেই common sense টাকে kill কইরা চাপা রাইখা দিয়া কাজটা করছো। sense কিন্তু তোমাকে conscious করে দিচ্ছে। ত্রুটি যে করছো, এটা করা উচিত নয়, জেনেও তা করছো। common sense যদি না জানাইত এই কথাটা, তাহলে বলতে পারতে আমাদের তো জানায় নাই। sense কিন্তু তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জানিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে যেটাই ফাঁক করতে যাইবা, যেটাই তুমি ফাঁকি দিতে যাইবা, যেইটাই তুমি গোপন করতে যাইবা, sense কিন্তু তোমাকে সবসময় সচেতন করে দিচ্ছে। ঐ ২০ হাজার কোটি মানুষ তোমার মধ্যে দিয়ে nature তোমার কত সুবিধা করে দিল। Nature এর কাজ, তার উদ্দেশ্য, তার গভীর তত্ত্বকে জানবার সুযোগ সুবিধা করে দিল। কত তার আশীর্বাদ। এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ কি হতে পারে? এর চেয়ে বড় দয়া কি হতে পারে যে তোমাকে সাহায্য করার জন্য ২০ হাজার কোটি মানুষ দিয়ে দিল। এরা অর্থাৎ ২০ হাজার কোটি মানুষ সম্পূর্ণ তোমার উপরে dependent. এদেরকে রক্ষা করা, এদেরকে মেরে ফেলা, এদেরকে অপচয় করা, এদেরকে যা কিছু ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তোমার।

Common Sense কে সামনে রাইখা, guard দিয়া প্রহরী রাইখা যদি কেউ ২০ হাজার কোটি মানুষকে protect করে রেখে দিতে পারে, তবে দুনিয়া দিগ্বিজয় কইরা সেই হইব মহান, সেই হইবো অবতার।

একটা মানুষের ভিতরে না হলেও সারাজীবনে যা বীর্যপাত হয়, এরকম বড় বড় দুই বালতি (২০ লিটারের বালতি)। তাহলে এখন একটা কথা আছে, এত যে হয়ে গেল শেষ, তাহলে আর আমাগো কি সব শেষ হয়ে গেল? এত যে শেষ হয়ে গেছে বাচ্চাগুলো জীবনভর যে শেষ করছে, তাহলে কি সব শেষ হয়ে গেল? শেষ হলো না। এখন থেকে যদি এটাকে preserve কর, তার থেকে সৃষ্টি হতে হতে আবার ২০ হাজার কোটিতে আসবে, fill up হয়ে যাবে। এটাই হইল nature এর fundamental basis. হাড় ভেঙ্গে গেলে ডাক্তাররা হাড়টা জোড়া দিতে পারতো না, nature-এর

নিয়মে হাড়ের সঙ্গে যেই কস থাকে, সেটা বেরিয়ে যদি জোড়া না দিত। ডাক্তাররা শুধু হাড়ের সাথে হাড় মিলাইয়া দিয়া bandage কইরা ছাইড়া দেয়। আর nature-এর এমনই system যে দুই হাড় একত্র হইয়া আবার জোড়া লাইগা যায়।

Preserve হইলেই বুঝতে পারবে। তোমার ২০ হাজার কোটি preserve হয়ে গেছে। আর কোন কিছু নাই, protected area হয়ে গেছে, seal মারা হইয়া গেছে। ওরা তোমার কাছে চিৎকার করতাছে। শুইয়া রইছো, বইয়া রইছো অথবা একা একা যাচ্ছ, ভিতরে একটা revolt করছে, একটা আন্দোলন করছে, 'আমাদের খোরাক দাও, আমাদের food দাও। Food না দিলে আমরা তোমাকে ছাড়বো না'। এই চিৎকার তুমি কিন্তু শুনছোনা। কিন্তু তোমার brain-এর মধ্যে গিয়া active হইয়া activities চালাচ্ছে। Brain এ গিয়া work করছে, তাইলে আমাদের কি করা উচিৎ? একটা কিছু করা উচিত।

একটা কিছু তো করা উচিত। একটা কিছু তো করা উচিত। নিজেই কইতাছ, পাগলের মতন। একা একা কথা কইতাছ। কিছু করবো। কিন্তু কি করবো? কি ব্যাপার? চাঁদের দিকে তাকাইয়া কথা কইতাছ, ইস্ চন্দ্র। কি সুন্দর আলো। এই যে আলো, সূর্যের আলোতেই তো আলোকিত। Automatically কথা কইতাছ। ২০ হাজার কোটি মানুষের brain তো ভিতরে কাজ করতাছে। হঠাৎ চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলছো, 'চাঁদের মধ্যে একটা পাথর দেখা যায় না?' কি কইতাছ নিজেই বুঝতাছ না। নিজেই জাননা কিছু। কিন্তু দেখতাছ সত্যি। সত্যিই একটা পাথর দেখতাছ। পাশে দাঁড়ানো একজনরে কইতাছ, 'দেখতো চাঁদে একটা পাথর দেখা যায় না? গোল পাথর?'

— কই না তো। চাঁদে পাথর? কি কইতাছ? তোমার মাথাটা খারাপ হইছে নাকি?

— না, আমার মাথা খারাপ হয় নাই। সত্যি; পাথর দেখতাছি। একটা বলের মত পাথর। পরিষ্কার দেখা যাইতাছে।

চাঁদ তো একহাতের ব্যাপার। ২০ হাজার কোটি মানুষ যদি জাইগা (জেগে) ওঠে, চাঁদ তো ১ হাতের ব্যাপার।

ভক্ত - বাবা, ২০ হাজার কোটি মানুষ সত্যিই জেগে যায়?

ঠাকুর, - জাগবো মানে? জাগার জন্যই দেওয়া। Nature বিনা কারণে কোন কিছুই দেয় নি।

'ও' তো দেখতাছে। অন্যরা দেখতাছে না। চাঁদের মধ্যে যদি কোন দুর্বা থাইকা থাকে, সেটাও দেখতে পাইতাছে। আবার চাঁদের মধ্যে যদি কোন ফাঁটা থাইকা থাকে, ফাঁটার মধ্যে কোন রেখা থাইকা থাকে, সেটাও পরিষ্কার দেখতে পাইতাছে। আর পাগল বললে কি হবে? 'ও' তো দেখতাছে। অন্যেরা যে দেখতাছে না, সেটা 'ও' বুঝতাছে। তাড়াতাড়ি বুইঝা ফেলাইব। quick answer. তাড়াতাড়ি answer দিয়া দিব। সবগুলি মাথা তো কাজ করতাছে। আরে ওই গ্রহের মধ্যে বাড়ীঘর দেখা যাইতাছে না? ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার। আরে, বাড়ীঘর দেখা যায়। অদ্ভুত ব্যাপার তো। দুই মাথাওলা লোক দেখি হাঁটতাছে সব। এখানে সব একমাথা। ঐখানে দেখি, দুই মাথা।

'ও' তখন বুঝবে, তোমরা বুঝতাছ না। 'ও' অনেক কিছু বুইঝা ফেলাইতাছে। ভিতর থিকা অরে বলতাছে, 'তুমি কাজ করে যাও। তুমি এভাবেই কাজ করে যাও। আমরা তোমাকে সাহায্য করতাছি। ঐগুলি দেখ। ভাল কইরা বোঝ।' ভিতর থিকা অরে guide করতাছে। অর ভাল লাগতাছে।

'ও' বলতাছে, 'আমি কাজ করবো। আমার ভাল লাগছে। আমি এভাবেই চলবো।' আমি দিনরাত কাজ করবো, এই নিয়ে চলবো।'

অর খুব আনন্দ হইতাছে। সাংঘাতিক কথা।

অর সামনে সবসময় একটা বিরাট রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন হয়ে যাচ্ছে সব জায়গায় জায়গায়। সব জায়গায় জায়গায়, জায়গায় জায়গায় কি হইতাছে সব দেখতাছে, বুঝতাছে। তারপরে কি হইব, সেইটাও বুইঝা ফেলাইতাছে।

একজনকে দেখলো, বসে লিখতাছে। পাশে একটা আপেল রেখেছে। আরেকজন এসে বললো, 'আপেলটা রেখেছিস্ কেন? খেয়ে নেব?

- নিয়ে নে।

'ও' সেখানে ছিলই না। কিন্তু দূর থেকে সব দেখলো। তাকে বললো, তুই আপেলটা পাশে রেখেছিলি কেন? থাবা দিয়ে নিয়ে গেল দেখলাম।

— তুই কি করে জানলি?

'ও' বুইঝা ফেলাইল তো। ২০ হাজার brain কাজ করতাছে তো। বহু বহু দূরের জায়গা অর হাতের সামনে। হঠাৎ মনে হইল, আমেরিকায় চেনা একজন আছে। দেখি তো, কি করে। 'ও' দেখতাছে, কি করতাছে।

তারপর লিখলো, 'দেখলাম, বৃহস্পতিবার এই করলা, এই করলা, এই করলা' অর্থাৎ কি কি কাজ করছে সব বললো। তারপর হাত থিকা প্লেটটা পইরা ভাইঙ্গা (ভেঙে) গেল দেখলাম।'

— তারা অবাক হয়ে লিখলো, তুমি কি কইরা জানলা (জানলে)?

হইয়া গেল কাম। সবসময় চিন্তা করবা, ২০ হাজার কোটি মাথা কাজ করতাছে কিন্তু। অর কাছে লন্ডনের দূরত্ব ১ বিঘতের মধ্যেও না। চাঁদ হইল ১ হাত। তাতে কি হইব জান? ন্যায়-অন্যায়গুলি সব বুইঝা ফেলাইতাছে। ত্রুটিগুলি সব বুইঝা ফেলাইতাছে। কার ভিতরে কি উদ্দেশ্য সব বুইঝা ফেলাইতাছে। Calculation এ সব বুইঝা ফেলাইতাছে। 'ক' রে দেইখা কইতাছে, কি সর্বনাশ, তুই সইরা পড়, সইরা (সরে) পড়, সইরা পড়। এর ত্রুটি বুঝতাছে, অর ত্রুটি বুঝতাছে। সব অর (ওর) সামনে স্পষ্ট হইয়া উঠতাছে। microscopic eye তো। সব বুইঝা ফেলতাছে। বুইঝা protection-এর কথা কইতাছে। তোমার চলার পথটা বুইঝা ফেলাইতাছে। নিজের চলার পথটা বুইঝা ফেলাইতাছে। যেখান দিয়া বেড়া দেখ, আবর্জনা দেখ, আরেক দিক দিয়া যাবে না? তবে? এই দিক দিয়া যদি গোলমাল দেখ, আরেকদিকে সরে যাবে না? নিজে বুইঝা বুইঝা চলতে হবে। বুঝছো ব্যাপারটা? অর কত সুবিধা হইয়া গেল গিয়া। 'ও' নিজেই সব বুইঝা বুইঝা করতাছে।

এত সুবিধা নিজেদের মধ্যে থাকতেও তোমরা কি করতাছ?

ভক্ত - বাবা, অনেকে তো জানে না

ঠাকুর - জানে না কি? নষ্ট করে।

কেমনে নষ্ট করে? গানে বাজনাতে, নাচেতে, চলতে ফিরতে, সবসময় sex টানতাছে তো। sex - এর রশ্মি টানতাছে। ঘুরতে বেড়াতে, দর্শনে, স্পর্শনে, চিন্তায়, ব্যস্ততায় সবটার মধ্যেই একটু একটু কইরা বাইরাইয়া (বেরিয়ে) যাইতাছে। সবগুলির মধ্য দিয়া বীর্য ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। বীর্য ক্ষয় হইয়া যাইতাছে কিন্তু। এতগুলি পথ দিয়া ক্ষয় হইয়া যাইতাছে। ব্যবহারে ক্ষয় হয়, চিন্তায় ক্ষয় হয়। energy (এনার্জি) দিতাছে এতগুলির মধ্যে, তাতেও ক্ষয় হইতাছে। 'মা, আমি যাইতাছি। আমার ভীষণ কাজ আছে।' কিছুই কাজ নাই। গল্প করতে, আড্ডা মারতে যাইতেছে। ওতেই (গল্প, আড্ডায়) পাত হয়ে যাচ্ছে। এই করতে করতে, করতে করতে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, একজনের ভিতরে গড়ে minimum ২০ হাজার কোটি মানুষ বসবাস করে। সত্যেন বোস (বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী) পায়ে ধইরা (ধরে) উবুত (উপুড়) হইয়া প্রণাম করছে কেন? আমাকে বলছে, ''আমাদের বিজ্ঞানের চিন্তাধারায় আরেক জীবন লাগবে এই চিন্তাধারা বার করতে। আপনি কতদূর কতদূর চলে গেছেন।''

এটা correct mathematics. সত্যি Nature এর কোন্ প্রয়োজন ছিল, ১০টা মানুষ সৃষ্টি করতে গিয়া ১০ কোটি মানুষ নষ্ট করবে? অপচয় করার জন্য আর নষ্ট করে শেষ করে দেবার জন্য, drainage করার জন্য এতগুলি মানুষকে সৃষ্টি করতে পারে না। drainage হয়ে যাচ্ছে। ১০ কোটি, ৫০ কোটি। তাইলে আটকাও। preserve কর। কোনদিকে কোন দরকার নাই। ব্যাপারটা হইছে কি? ঐটার

যারা নিজেদের পাত কইরা এতটুকুনু তৃপ্তি দিতে পারে, তাদের ধরে রাখলে, preserve করলে, তারা কতটা তৃপ্তি দিতে পারে। ২০ হাজার কোটি একত্র থাইকা যদি সেই তৃপ্তিদান করে, তারা অগাধ তৃপ্তির সাগর তৈরী করতে পারে।

আরেকটা দৃষ্টান্ত তোমরা বিশেষ কইরা মনে রাইখা দিও। যেই জিনিসের সুখ বা তৃপ্তি পাও অতি সহজে, যেটা সহজে পাও বলে তোমরা মনে কর, সেই তৃপ্তিটা ধরে নাও গড়ে এতটুকু। আর ২০ হাজার কোটি যদি সেই তৃপ্তিতে একত্রিত করো, তাইলে কত বড় হইয়া যায়। একটা সঙ্গমে তোমরা ছেলে বা মেয়ে যে তৃপ্তিটা পাও এতটুকুনু, ক্ষণিকের এতটুকুনু তৃপ্তি। তাতে যে পাত হইল, তোমরা তো মনে কর, ক্ষণিকের পাত কইরা শেষ কইরা থুইলা (রাখলে)। তারমধ্যেও ১০ হাজার, ২০ হাজার চইলা যায় একেকটা পাতে। যে জিনিস পাত হওয়ার পথে নিজেকে নিঃশেষ করে আনন্দ বা সুখ দান করে, তাদের কথা কেউ মনে রাখে না। আনন্দ দান করে কিন্তু তারা, যারা বের হয়। তারা বেরিয়ে (বের হয়ে গিয়ে) তোমাকে আনন্দ দিচ্ছে। কথাটা ভুলে যেও না। যার সাথে সঙ্গম করছে, সে কিন্তু আনন্দ দান করছে না। সে কিন্তু উপলক্ষ্য। ঐটা বের করার উপলক্ষ্য। যে পথ দিয়া বের হয়, সেইটুকুনু শুধু সে তোমাকে তৃপ্তি দিচ্ছে বইলা মনে করছো, ঐ পাতটুকুনুই তৃপ্তি। কি কইছি, বুঝতে পারছো? ঐ পাতটুকুনুই তৃপ্তি। যারা নিজেদের পাত কইরা এতটুকুনু তৃপ্তি দিতে পারে, তাদের ধরে রাখলে, preserve করলে, তারা কতটা তৃপ্তি দিতে পারে। ২০ হাজার কোটি একত্র থাইকা যদি সেই তৃপ্তিদান করে, তারা অগাধ তৃপ্তির সাগর তৈরী করতে পারে।

আর তোমাগো যে তৃপ্তিটা দিচ্ছে, তৃপ্তি ঠিকই দিচ্ছে এতটুকু, সেই তৃপ্তিতে মাঝে মাঝে তোমরা ঘোর (ঘোরাঘুরি কর)। কি ছেলে কি মেয়ে - কোথায় যাইতেছে, কোথায় স্প্লেনেডের মোড়, ধর্মতলার মোড়, কোথায় জলসার মোড়, কে কোথায় দাঁড়াইল, কে কোথায় গেল, কে কোথায় নাচলো, কে কোথায় চিঠি দিল, এতটুকুনু তৃপ্তির জন্য তোমরা উন্মাদ। আর কিচ্ছু না। এইটুকুর জন্য যে চেষ্টা তোমরা করতাছ, তারচেয়ে ১০ ভাগের ১ ভাগ চেষ্টা করলে, আরও অগণিত তৃপ্তির সন্ধান তোমরা পেতে পার। তাদেরে যদি তুমি আটকিয়ে রাখতে পার, তারাই তোমাকে তৃপ্তির সন্ধান দেবে। তারাইতো তৃপ্তিটা দিচ্ছে বেরিয়ে গিয়ে। প্রস্রাব করতে গেলে ঐ তৃপ্তি পাও? প্রস্রাব করতে গেলে ঐ তৃপ্তি পেলে তো আর সঙ্গম করতেই না। প্রস্রাবের হইল একরকম তৃপ্তি আর অরা বাইরাইয়া গেলে হইল আরেকরকম

তৃপ্তি। কথাটা বুইঝো। কিন্তু অরা (ভিতরের মানুষগুলো) বলতাছে, "আমাগো বাইর কইরা দিলেও আমরা তৃপ্তি দিয়া যাই।" আমরা এত ভাল। আমরা বাইরাইয়া গিয়াও তোমাদের সাময়িক একটুখানি তৃপ্তি দিয়া যাই। এই তৃপ্তি হইল মরণের তৃপ্তি। ভোগে দুর্ভোগ এই তৃপ্তি । এই তৃপ্তির উন্মাদনায় তোমরা কত অন্যায়, অপরাধ, ত্রুটি, বিচ্যুতি করতাছ। আর যদি ২০ হাজার কোটি মানুষরে তোমার ভিতরে preserve করতে পার, রাইখা দিতে পার, তবে অনন্ত শক্তির অধিকারী হয়ে তুমি কী না করতে পার? তাই পথিক হও সাবধান। সঠিকতার সুরে পথ চল। তবেই পাবে সঠিক পথের সন্ধান।

তাই বাচ্চা বয়স থেকে ক্ষেত নিড়াচ্ছি। আর কাজ করছি লক্ষ লক্ষ লোকের হয়ে। জাগো জাগো, সুফল ফলাও। বাবা চলে গেছেন। বুড়ী মা আমার চলে গেল। প্রত্যেকেরই বাবা মা চলে যাবেন, চলে যাচ্ছেন। তুমিও চলে যাবে। আর সময় নাই। সময় খুব সংকীর্ণ। আর তো সময় নাই। সব বিদেহীরা এখানে আশ্রয় নিয়েছ এই ভূগর্ভে, এই পৃথিবীর মাটিতে। তোমরা বিদেহীরা দেহের মাঝে আশ্রয় নিয়ে আজ সব নৃত্য করছো, খেলা করছো। এইসব ভূতের নৃত্যের মত চলছে। পঞ্চভূতের নৃত্য চালাচ্ছো। পঞ্চভূত যেন নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তির বাইরে না যায়, বুঝতে পেরেছ? সাবধান হয়ে থেকো। এই বাণী সাধারণের মত বাণী নয়; মামুলী সাবধানতার বাণী নয়। এটা ঘরোয়ানা বাণী, মনে রেখো। এই তত্ত্বের তুলনা হয় না; অতুলনীয়। আমি কুলিকামারি, অলঙ্কার গড়তে পারি না। আমি একেবারেই কুলিকামারি। তত্ত্বের ভান্ডার আমার কাছে উন্মুক্ত। আমি খনি থেকে তত্ত্ব তুলে এনে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। এটাই আমার কাজ। আজ এই থাক।

সব বিদেহীরা এখানে আশ্রয় নিয়েছ এই ভূগর্ভে, এই পৃথিবীর মাটিতে। তোমরা বিদেহীরা দেহের মাঝে আশ্রয় নিয়ে আজ সব নৃত্য করছো, খেলা করছো।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

		প্রকাশকাল
১)	বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২)	মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩)	পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪)	সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫)	অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬)	১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭)	বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮)	শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯)	তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০)	দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) অনির্বাণ - মা সারদা কমপ্লেক্স, রাজপুর, সোনারপুর, ফোন-২৪৭৭-৬৫৬৬
২) কৃষ্ণা S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
৩) রাম নারায়ণ রাম ভবন, মিত্র কুটির ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান